# ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই ‘প্রাণ’ কি এবং এর উৎপত্তি কোথা থেকে এই কৌতুহল মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জীব এবং জড়ের পার্থক্য এতোই প্রখর এবং বৈচিত্রময় যে এদের সীমানা নির্ধারণে কি নিয়ামক কাজ করেছে তা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামিয়ে আসছে বহুদিন ধরে। তবে সাম্প্রতিক কিছু বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের কাছে জীব এবং জড়ের সীমারেখা ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে বলেই মনে হচ্ছে। কিছু কিছু ভাইরাস, ভিরইডস, প্রিয়ন এবং কিছু পেপটাইডের শিকল জীব এবং জড়ের সীমারেখার মধ্যে এমনভাবে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে যে জীব এবং জড়ের মধ্যে পরিস্কার সীমারেখা টানা আসলেই দুস্কর হয়ে গেছে। এই অনুজীবগুলো কখনো মনে হয় জীবন্ত আবার কখনো মনে হয় পুরোপুরি জড়। প্রাণকে দীর্ঘকাল ধরেই ‘রহস্যময় উপাদান’ হিসাবে চিহ্নিত করে এসেছে বিজ্ঞানী, দার্শনিক সহ সাধারণ মানুষেরা। পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের সুত্রপাত হল তার পুরোপুরি রহস্য উন্মোচন এখন পর্যন্ত কেউই সঠিক ভাবে করতে পারেনি। এমনকি চার্লস ডারউইন ১৮৫৯ সালে লেখা যুগান্তকারী বই ‘Origin of Species’- এ প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ও এর বিবর্তনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করলেও প্রাণের উৎস সম্পর্কে ছিলেন নিরব। ডারউইনের বক্তব্য ছিল, ‘এর চেয়ে বরং পদার্থের উৎপত্তি নিয়ে ভাবা যেতে পারে।’ বলাবাহুল্য, বিগত শতকের আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকে পদার্থের উৎপত্তির রহস্য অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি বিজ্ঞানীদের জন্য এখনও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এ জন্যই ডিএনএ যুগল সর্পিলের রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তার ‘Life itself: Its nature and origin’ গ্রন্থে বলেন : ‘সমস্ত প্রয়োজনীয় শর্তকে পরিতুষ্ট করে জীবনের উদ্ভব যেন প্রায় আলৌকিক ঘটনা’!

প্রাণ নিয়ে সবচেয়ে পুরাতন এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্বাসী ধারণা হচ্ছে যে, ঈশ্বর বা অলৌকিক কোন সত্তা পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটিয়েছে। ইতিহাসের একটা বড় অংশ জুড়েই বিশ্বাস করা হয়েছে যে প্রাণ স্বর্গ থেকে এসেছে এবং ঈশ্বর মানুষসহ সব প্রাণীদেরকে বর্তমানরূপেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। প্লেটোর ভাববাদী দর্শনও শিখিয়েছে যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বর যখন প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহে আত্মা প্রবেশ করান, তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এই ‘জীবনশক্তি তত্ত্ব’ অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে প্রায় দু’হাজার বছর মানব সভ্যতাকে শাসন করেছিল। পরবর্তীতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমত এই দর্শনকে ‘মূল উপজীব্য’ হিসেবে আত্মস্থ করে নেয়। তাই অধিকাংশ মানুষ আজও আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রাচীন প্রয়াস থেকে মুক্তি পায়নি। ধর্মবিশ্বাসীরা এবং বিশেষ করে আধুনিক ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’-এর প্রবক্তাদের মতে প্রাণের উৎপত্তির কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। ভাগ্য ভাল যে এই শ্রেনীর লোকজনদের কূপমুন্ডুক চিন্তাভাবনা বা বিশ্বাসনির্ভর ‘তত্ত্ব’গুলোকে আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা তেমন একটা আমলে নেন না। যেহেতু প্রাণের উৎপত্তির এই অতিন্দ্রীয় ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করা যায় না, সেহেতু বিজ্ঞানীরা এই ধরণের ধারণাকে বৈজ্ঞানিক সীমারেখার বাইরেই রেখে দিতে বেশি পছন্দ করেন। আর তাছাড়া বিজ্ঞান অজ্ঞেয়বাদী নয়, খুব কঠোরভাবেই বস্তুবাদী। কাজেই বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক ভাবেই প্রাণের উৎপত্তির রহস্যের সমাধান চান। বেশিরভাগই বিজ্ঞানীই মনে করেন এ পৃথিবীতেই নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে এবং তা কোন রহস্যজনক কারণে নয়, বরং জানা কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তারা মনে করে থাকেন যে, সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বিজারকীয় পরিবেশে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে। জীবনের এই ‘রাসায়নিক উৎপত্তি’ তত্ত্ব নিয়ে এ বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ কিছু সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফল এতে

সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনের মতবাদ অনুযায়ী মহাকাশ থেকে ধুমকেতু বা উল্কাপিন্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীই বর্তমানে এই ধারণার উপর তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। আগে মনে করা হত মহাকাশের বিশাল দূরত্ব, তেজস্ক্রিয়তা, বায়ুশূন্যতা ইত্যাদি সামলিয়ে সুদূর বহির্বিশ্ব থেকে কোন অনুজীবের পৃথিবীতে এসে প্রাণের উন্মেষ ঘটানো স্রেফ অসম্ভব একটি ব্যাপার। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণালব্ধ ফলাফল এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে প্যানস্পারমিয়া নামের 'বহির্বিশ্বে প্রাণের উৎপত্তি' তত্ত্বটি ইদানিংকালে অনেক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকেই জোরালো সমর্থন পাচ্ছে। গত সপ্তদশ শতক থেকেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাণের বিকাশের ধারণার ক্ষেত্রে বার বার বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। আর বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং এই শতাব্দীতে প্রাণের উৎপত্তির প্রশ্ন এবং মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমাদের এ পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, কিংবা এর সম্ভাব্যতা কতটুক এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়ত এ বইটির আরেকটি আকর্ষনীয় দিক হিসেবে পাঠকদের সামনে চলে আসতে পারে। সমগ্র মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ তারকারাজির মধ্যে পৃথিবীর অবস্থান যেন সাহারা মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্র। শুধুমাত্র আমাদের আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিতেই নক্ষত্রের সংখ্যা চল্লিশ হাজার কোটি। আর এ ধরণের গ্যালাক্সির সংখ্যা পুরো মহাবিশ্বে কম করে হলেও অন্ততঃ একশ কোটি। আবার গ্যালাক্সিগুলোতে সূর্যের মত অনেক নক্ষত্রেরই আছে গ্রহমন্ডল। সুবিশাল এই মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রমালার কোন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা তাই মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মহাবিশ্বে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবণা কতটুকু, আমাদের এ সৌরজগতের মধ্যেই কোন গ্রহে প্রাণের উদ্ভবের উপযোগী পরিবেশ বিরাজ করছে কিনা, সৌরজগতের বাইরে মহাজাগতিক কাল্পনিক বন্ধুদের প্রতি আমরা মর্তবাসীরা এর মধ্যে কোন বার্তা পাঠিয়েছি কিনা, কিংবা মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা আমাদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি কিনা এসমস্ত বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণবন্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতই ড্রেক সমীকরণ, ফার্মির গোলকধাঁধা নিয়েও সচেতন ও অগ্রসর পাঠকদের জন্য বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হয়ছে। বইটি পাঠকদের কিছুটা হলেও চিন্তার খোরাক যোগাবে বলে মনে করি।

যদিও প্রাণের উৎপত্তি এবং মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তা থাকার সম্ভাব্যতা নিয়ে অনেকেরই প্রচন্ড আগ্রহ রয়েছে তা সত্ত্বেও এ নিয়ে গবেষণা এবং লেখালেখি বাংলায় খুব বেশি হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে আমাদের জানা মতে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাযুক্ত বই একেবারেই অপ্রতুল। বাংলা ভাষাভাষি পাঠকদেরকে সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রাণ এবং প্রাণের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বাংলায় যারা বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখি করেন তাদের সকলেরই জানা আছে যে এটা কত ভয়ংকর কষ্টের। সঠিক পরিভাষা খুঁজে পাওয়ার জন্য মাথার চুল ছেঁড়েননি এমন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক বিরল। এ যে কি পরিমান ভোগান্তি তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। আমরা পরিভাষার জন্য মূলতঃ 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' এবং 'সংসদ বিজ্ঞান পরিভাষা'র সাহায্য নিয়েছি। তারপরও বহু জায়গায় আটকে যেতে হয়েছে। যেমন, Extremophile-এর কোন সঠিক বাংলা আমরা পাইনি, আমরা এর নামকরণ করেছি চরমজীবী। তেমনিভাবে Tube worm কে বলেছি নল কৃমি ইত্যাদি। Replication-এর বাংলা কখনও করা হয়েছে প্রতিরূপায়ন, কখনও বা অনুলিপি। একঘেয়েমি এড়ানোর জন্যই মূলতঃ এ ধরনের কৌশলের আশ্রয় নেয়া। অজনপ্রিয় এবং অপ্রচলিত বাংলা যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। সেজন্যই এ

বইয়ে আমরা ‘Oxygen’কে ‘অক্সিজেন’ই রেখেছি, ‘অম্লজান’ বলিনি, কিংবা ‘Carbon dioxide’কে কার্বন ডাইঅক্সাইড রেখেছি, ‘অঙ্গার দ্বিঅম্লজ’ লিখিনি। এক্ষেত্রে সঠিক বাংলা প্রচলনের প্রচেষ্টার চেয়ে বরং ভাষার গতিশীলতা বজায় রাখাটাই আমাদের কাছে প্রাধাণ্য পেয়েছে বেশি।

এ বইটি সিরিজ আকারে মুক্তমনায় প্রকাশের সময় পাঠকদের কাছ থেকে আমরা অনেক সাড়া পেয়েছি। বহু পাঠক তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে বইটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন। বিশেষ করে মুক্তমনার একসময়কার সক্রিয় সদস্য (বর্তমানে ভিন্নমত ওয়েবসাইটের মডারেটর) ডঃ বিপ্লব পাল বইটির মানোন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপারে বেশ কিছু চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন এবং আন্তর্জালে এর একটি সুন্দর পর্যালোচনা লিখেছেন। এ বইটি সিরিজ আকারে ডঃ সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের বিজ্ঞান সাময়িকী ‘সায়েন্স ওয়ার্ল্ডে’ও বেশ কিছু প্রবন্ধ পৃথকভাবে ছাপা হয়েছে। এদের সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাঠকদের মতামত ছাড়াও আমাদের চেনা জানা অনেক জীববিজ্ঞানীদের সাথে বইটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ ম. আখতারুজ্জামানের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। তিনি যত্ন নিয়ে পান্ডুলিপিটি পড়ে মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন, জায়গায় জায়গায় বেশ কিছু সংশোধনও করেছেন। আর ধন্যবাদ জানাই বইয়ের প্রাকশক আলমগীর রহমানকে, যাঁর উৎসাহ আর আগ্রহ ব্যতীত এ বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। অবসর প্রকাশনীর জাকির আহমেদ বইটির কম্পিউটার কম্পোজের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। আলমগীর রহমান এবং অবসর প্রকাশনীর সাথে প্রাথমিকভাবে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক শফি আহমেদকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। তিনি শুধু প্রকাশকের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, সময় সময় পান্ডুলিপির ব্যাপারে খোঁজ-খবরও নিয়েছেন। মুক্তমনার উৎসাহী সদস্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনন্ত বিজয় দাস এই বইটির প্রকাশনার ব্যাপারে শুধু আগ্রহ কিংবা উৎসাহই দেখাননি, প্রকাশক ও লেখকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে বইটি সঠিক সময়ে প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করেছে। তাকে আলাদা করে ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় হবে, তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের এই লেখা পড়ে বাংলাভাষি মাত্র একজন লোকও যদি, ছোটবেলা থেকে রক্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, তবে সেক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কষ্টকে সার্থক বলে মনে করবো।

সকলের মঙ্গল কামনায়।

*অভিজিৎ রায়* (charbak_bd@yahoo.com)
*ফরিদ আহমেদ* (farid300@gmail.com)
মুক্তমনা (www.mukto-mona.com)
নভেম্বর ২০, ২০০৬

প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য...

# প্রানের প্রান জাগিছে তোমারি প্রানে –১

অভিজিৎ রায়

‘তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে,
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি,
মোর শেষ কথা।’

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



## আছে জন্ম, আছে মৃত্যু, আছে প্রাণ :

প্রাণ বা জীবন কি (What is life?)- এ প্রশ্নটি মানব মনের সব চাইতে পুরাতন অথচ কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্নগুলোর একটি। এ প্রশ্নটির ব্যঞ্জনায় যুগে যুগে আলোড়িত হয়েছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যিক, কবি, গীতিকার, দার্শনিক, বৈরাগী সকলেই। গীতিকারেরা গান রচনা করেছেন - ‘জীবন - সে তো পদ্মপাতায় শিশির বিন্দু’। কবি তার

কল্পণার মায়াজাল বুনে লিখেছেন- 'life is nothing but an empty dream'। বৈরাগী হয়ত মারফতি করে বলেছেন - 'জীবনটা তো মায়া ছাড়া আর কিছু নয়'। আসলে জীবনটা যে সত্যিই কি - এ প্রশ্নের উত্তর দার্শনিক-অদার্শনিক, পন্ডিত-মূর্খ কারো কাছেই খুব সঠিকভাবে বোধ হয় পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন বা প্রাণ কি এটা জানতে হলে 'জীবন কি নয়' এটা বোধ হয় আগে ভালভাবে জানা দরকার। জীবজগৎ আর জড়জগৎ - এ নিয়েই আমাদের চিরচেনা বিশ্বজগৎ। প্রাণের নিশ্চয়ই এমন কোন নান্দনিক বিশিষ্টতা আছে যা জড় পদার্থ থেকে আলাদা। আর সে কারণেই অ্যামিবা, পুঁটিমাছ, কচু শাক, হাতি, তিমি, ইঁদুর বা মানুষদের সহজেই ইট, কাঠ, লোহা, পাথর থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি সেই নান্দনিক বিশিষ্টতা?

প্রাচীনকালের মানুষেরা যে এ সমস্যা নিয়ে ভাবেনি তা নয়। জীবিতদের কি ভাবে সনাক্ত করা যায়? একটি মৃতদেহ আর একটি জীবিত দেহের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? এ প্রশ্নগুলো দিয়ে তাদের অনুসন্ধিৎসু মন সবসময়ই আন্দোলিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে তারা শেষপর্যন্ত কল্পনা করে নিয়েছে অদৃশ্য আত্মার। ভেবেছে আত্মাই বুঝি জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্র। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে তারা ভেবেছে ঈশ্বরের নির্দেশে আজরাইল বা যমদূত এসে প্রাণহরণ করলেই কেবল একটি মানুষ মারা যায়। আর তখন তার দেহস্থিত আত্মা পাড়ি জমায় পরলোকে। মৃত্যু নিয়ে মানুষের এ ধরনের ভাববাদী চিন্তা জন্ম দিয়েছে আধ্যাত্মবাদের। আধ্যাত্মবাদ স্বতঃপ্রমাণ হিসেবেই ধরে নেয়-'আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।' মজার ব্যাপার হল, একদিকে যেমন আত্মাকে অমর অক্ষয় বলা হচ্ছে, জোর গলায় প্রচার করা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, আবার সেই আত্মাকেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবই আধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। ধর্মগ্রন্থগুলি ঘাটলেই এ ধরনের স্ববিরোধিতার হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছে মানুষ। কারণ সে সময় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল সীমিত। মৃত্যুর সঠিক কারণ ছিল তাদের জানার বাইরে। সেজন্য অনেক ধর্মবাদীরাই 'আত্মা' কিংবা 'মন' কে জীবনের আধাররূপী বস্তু হিসেবে কল্পনা করেছেন। যেমন, ইসলামিক মিথ্ বলছে, আল্লাহ মানবজাতির সকল আত্মা একটি নির্দিষ্ট দিনে তৈরী করে বেহেস্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (ইল্লিন) বন্দি করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই নতুন নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য একেকটি আত্মাকে তুলে নিয়ে মর্তে পাঠানো হয়। আবার আচার্য শঙ্কর তার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, 'মন হল আত্মার উপাধি স্বরূপ'। ওদিকে আবার সাংখ্যদর্শনের মতে - 'আত্মা চৈতন্যস্বরূপ' (সাংখ্যসুত্র ৫/৬৯)। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, 'চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম।' (ষড়দর্শন সমুচ্চয়, পৃঃ ৫০) স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবতেন, 'চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা।'

(বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ১৬২) স্বামী অভেদানন্দের মতে, 'আত্মা বা মন মস্তিস্ক বহির্ভুত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়।' (মরণের পারে, পৃঃ ৯৮)। গ্রীক দর্শনেও আমরা প্রায় একই রকম ভাববাদী দর্শনের ছায়া দেখতে পাই। প্লেটোর বক্তব্য ছিল যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র যখন আত্মা প্রাণী বা উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। সব ধর্মমতই প্রচলিত এই ধারণার সাথে সঙ্গতি বিধান করে। প্লেটোর এই তত্ত্ব অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে প্রায় দু-হাজার বছর রাজত্ব করে। অ্যারিস্টটলের পরবর্তী গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রসারিত করে পরবর্তী যুগের চাহিদার উপযোগী করে তোলেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে নয়া প্লেটোবাদীরা 'ঈশ্বর অজৈব বস্তুর মধ্যে জীবন সৃষ্টিকারী আত্মা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে জীবন দান করেন' - এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। নয়া প্লেটোবাদী প্লাটিনাসের মতে, 'জীবনদায়ী শক্তিই জীবনের মূল।' বস্তুতপক্ষে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'জীবনশক্তি' (life force) তত্ত্ব এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে এবং জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিও জোরালো হয়। ধর্মবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, ভয় সব কিছু মিলে শিক্ষিত সমাজে এই ভাববাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটে।



**চিত্র ১.১** :ক) নিয়ান্ডার্থালদের মৃতদেহ কবর দেওয়ার সময় পারলৌকিক আচার আচরণ খ) শানিদার গুহায় পাওয়া ফসিলের অবশেষ।

আসলে আত্মার অস্তিত্বের ব্যাপারটি মানুষের মৃত্যুভয়ের সাথে অঙ্গাংগি ভাবে জড়িত তাই তা জনমানসে রাজত্ব করেছে দীর্ঘকাল। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আত্মা দিয়ে জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার করার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিলো নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মাচরণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল

একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় অনেক সরল। ইরাকের শানিদার নামের একটি গুহায় নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গেছে যা দেখে অনুমান করা যায় যে, নিয়ান্ডার্থালরা প্রিয়জন মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করতো। এমনকি তারা মৃতদেহ কবর দেয়ার সময় এর সাথে পুষ্পরেণু, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্র সামগ্রী, শিয়ালের দাঁত এমনকি মাদুলীসহ সব কিছুই দিয়ে দিত যাতে পরপারে তাদের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে আর সঙ্গে আনা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর যুক্তির প্রসারের ফলে আজ কিন্তু আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো মানুষের চোখে সহজেই ধরা পড়ছে। যদি জীবনকে 'আত্মার উপস্থিতি' আর মৃত্যুকে 'আত্মার দেহত্যাগ' দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তো যে কোন জীবিত সত্ত্বারই - তা সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণীই হোক- আত্মা থাকা উচিৎ। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেহে কি কেবল একটিমাত্র আত্মা থাকবে নাকি একাধিক? যেমন, বেশ কিছু উদ্ভিদ - গোলাপ, কলা, ঘাসফুল এমন কি হাইড্রা, কোরালের মত প্রাণীরাও কর্তন (Cut) ও অঙ্কুরোদ্গমের (Bud) মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। তাহলে কি সাথে সাথে আত্মাও কর্তিত হয়, নাকি একাধিক আত্মা সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয়? আবার মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে, পানিতে ডুবে যাওয়া, শ্বাসরুদ্ধ, মৃত বলে মনে হওয়া/ঘোষিত হওয়া অচেতন ব্যক্তির জ্ঞান চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় - তখন কি দেহত্যাগী বৈরাগী আত্মাকেও সেই সাথে ডেকে ঘরে থুড়ি দেহে ফিরিয়ে আনা হয়? প্রজননকালে পিতৃদত্ত শুক্রানু আর মাতৃদত্ত ডিম্বানুর মিলনে শিশুর দেহকোষ তৈরী হয়। শুক্রানু আর ডিম্বানু জীবনের মূল, তাহলে নিশ্চয় তাদের আত্মাও আছে। এদের আত্মা কি তাদের আভিভাবকদের আত্মা থেকে আলাদা? যদি তাই হয় তবে কিভাবে দুটি পৃথক আত্মা পরষ্পর মিলিত হয়ে শিশুর দেহে একটি সম্পূর্ণ নতুন আত্মার জন্ম দিতে পারে? মানব মনের এ ধরনের অসংখ্য যৌক্তিক প্রশ্ন আত্মার অসারত্বকেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে।

আর ভাববাদীরা যাই বলুক না কেন স্কুলের পাঠ শেষ করা ছাত্রটিও আজ জানে, মন কোন 'বস্তু' নয়; বরং মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষের কাজ কর্মের ফল। চোখের কাজ যেমন দেখা, কানের কাজ যেমন শ্রবণ করা, পাকস্থলীর কাজ যেমন খাদ্য হজম করা, তেমনি মস্তিস্ক কোষের কাজ হল চিন্তা করা। তাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেন: 'বিস্ময়কর অনুকল্পটি হল: আমার 'আমিত্ব', আমার উচ্ছ্বাস, বেদনা, স্মৃতি, আকাংখা, আমার সংবেদনশীলতা, আমার পরিচয় এবং আমার মুক্তবুদ্ধি এগুলো আসলে মস্তিস্কের স্নায়ুকোষ এবং তাদের আনুষঙ্গিক অণুগুলোর বিবিধ ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।' মানুষ চিন্তা করতে পারে বলেই নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মত করে সাজাতে পারে, সত্য-মিথ্যের মিশেল দিয়ে কল্পণা করতে পারে তার ভিতরে 'মন' বলে সত্যই কোন পদার্থ

আছে, অথবা আছে অদৃশ্য কোন আত্মার আশরীরী উপস্থিতি। মৃত্যুর পর দেহ বিলীন হয়। বিলীন হয় দেহাংশ, মস্তিস্ক স্নায়ুকোষ। আসলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু মানেই কিন্তু 'মন' এর মৃত্যু, সেই সাথে মৃত্যু তথাকথিত আত্মার। অনেক সময় দেখা যায় দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ ঠিকমত কর্মক্ষম আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। এ ধরনের অবস্থাকে বলে কোমা। মানুষের চেতনা তখন লুপ্ত হয়। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে জীবিত দেহ তখন অনেকটা জড়পদার্থের মতই আচরণ করে। তাহলে জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্রটি রক্ষা করছে কে? এ কি অশরীরী আত্মা, নাকি মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষের সঠিক কর্মক্ষমতা?

এ পর্যায়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার রমণ লাম্বার মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করা যাক। ১৯৯৮ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে (বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) লীগের খেলা চলাকালীন সময় মেহেরাব হোসেন অপির একটি পুল শট ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিংরত লাম্বার মাথায় সজোরে আঘাত করে। প্রথমে মনে হয়েছিল তেমন কিছুই হয় নি। নিজেই হেঁটে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারালেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করলেন। পরদিন ২১ এ ফেব্রুয়ারী তাকে পিজি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হল। সেখানে তার অপারেশন হল, কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। পরদিন ২২ এ ফেব্রুয়ারী ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন যে, মস্তিষ্ক তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুসের কাজ চলছিল।



**চিত্র ১.২ :** রমন লাম্বা : মেধাবী ক্রিকেটারের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু

২৩ ফেব্রুয়ারী বিকেল সাড়ে তিনটায় তার আইরিশ স্ত্রী কিমের উপস্থিতিতে হার্ট লাং মেশিন বন্ধ করে দিলেন চিকৎসকেরা। থেমে গেল লাম্বার হৃৎস্পন্দন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডেথ

সার্টিফিকেটে মৃত্যুর তারিখ কোনটি হওয়া উচিৎ? ২২ নাকি ২৩ ফেব্রুয়ারী? আর তার মৃত্যুক্ষণটি নির্ধারণ করলেন কারা? আজরাইল/যমদূত নাকি চিকিৎসারত ডাক্তারেরা?

এ ব্যাপারটি আরও ভালভাবে বুঝতে হলে মৃত্যু নিয়ে দু'চার কথা বলতেই হবে। জীবনের অনিবর্তনীয় পরিসমাপ্তিকে (Irreversible cessation of life) বলে মৃত্যু। কেন জীবের মৃত্যু হয়? কারণ আমরা (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) উত্তরাধিকার সূত্রে বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যারা যৌনসংযোগের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে প্রকৃতিতে টিকে রয়েছে তাদের থেকে মরণ জিন (Death Gene) প্রাপ্ত হয়েছি এবং বহন করে চলেছি। এই ধরনের জিন (Death Gene) তার পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পিত উপায়েই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। যৌনজননের মাধ্যমে বংশবিস্তাররেরে ব্যাপারটিতে আমি এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, যে সমস্ত প্রজাতি যৌনজননকে বংশবিস্তারের একটি মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদের 'মৃত্যু' নামক ব্যাপারটিকেও তার জীবগত বৈশিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে। দেখা গেছে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে সেক্স-সেল বা যৌনকোষগুলোই (জীববিজ্ঞানীরা বলেন 'জার্মপ্লাজম') হচ্ছে একমাত্র কোষ যারা সরাসরি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে নিজেদের জিন সঞ্চারিত করে টিকে থাকে। সে তুলনায় দেহকোষগুলো হয় স্বল্পায়ুর। অনেকে এই ব্যাপারটির নামকরণ করেছেন 'প্রোগ্রামড্ ডেথ'। এক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী হালকাচালে তার একটি লেখায় বলেছেন, 'মৃত্যু'ও বোধহয় সিফিলিস বা গনোরিয়ার মত একধরনের 'Sexually Transmitted Disease' যা আমরা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টির শুরু থেকে বহন করে চলেছি! ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মত সরল কোষী জীব যারা যৌন জনন নয়, বরং কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে টিকে আছে তারা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই অমর। এদের দেহ কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়, তার পর বিভাজিত অংশগুলিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বিভাজিত হয়; কোন অংশই আসলে সেভাবে 'মৃত্যুবরণ' করে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'মৃত্যু' ব্যাপারটি সব জীবের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক নয়। তবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে রাসায়নিক জীবাণুনাশক ঔষধপত্রাদির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে জীবাণুনাশের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে আলাদা।

আসলে মানুষের মত বহুকোষী উচ্চশ্রেনীর প্রাণীদের মৃত্যু দু' ধরনের। দেহের মৃত্যু (Clincal Death) এবং কোষীয় মৃত্যু (Cellular Death)। দেহের মৃত্যুর স্বল্প সময় পরেই কোষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ রয়েছে - মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, আর ফুসফুস। যে কোন একটির বা সবগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হলে মৃত্যু হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বন্ধ হলে কোমা হয়, রমণ লাম্বার ক্ষেত্রে যেটি ঘটেছে; হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে সিনকোপ, আর ফুসফুসের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে আসফিক্সিয়া। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু 'মৃত্যু' ব্যাপারটার সংজ্ঞা দেওয়া এতোটা কঠিন ছিলো না। খুব সহজ সংজ্ঞা। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ফুসফুস তার হাপরের উঠানামা

বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তির জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৬৮ সালে হৃৎসংস্থাপন (Heart Transplant) প্রক্রিয়ার আবিস্কার এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের পর মৃত্যুর এই সংজ্ঞা কিন্তু বদলে যায়। কিভাবে এখন হলফ করে সেই 'হৃদয়দাতা'কে মৃত বলা যাবে যখন চোখের সামনেই তার হৃদয় অন্যের দেহে স্পন্দিত হয়ে চলেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরো ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে ফেললো শ্বাসযন্ত্র বা রেস্পিরেটর আবিস্কার করে- যেটি হৃৎপিন্ড আর ফুসফুসকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আধুনিক কোন কবি কিন্তু এখন মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতেই পারেন এই বলে যে - 'হে হিমশীতল মৃত্যু - তুমি হচ্ছ রেস্পিরেটর সুইচের সহসা নির্বাপন!'

যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জীবন আয়ু ত্বরান্বিত করার ব্যাপারটি খুব সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক মৃত্যুপথ যাত্রী অসুস্থ রোগীর মৃত্যু নানাভাবে বিলম্বিত করা গেছে - কারো কারো জন্য কম সময়ের জন্য, আবার কারো জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য। যেমন ধরুন বার্নি ক্লার্ক নামের এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের উদাহরণ, যিনি ১৯৮২ সালে নিজের রোগাক্রান্ত হৃৎপিন্ডের পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক হৃদয় নিয়ে বেঁচে ছিলেন কয়েক মাস যাবৎ। আবার ১৯৮৪ সালে সদ্যজন্মলাভ করা শিশু ফে কে অতিরিক্ত ২০দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিলো একটি বেবুনের হৃৎপিন্ড সংযোজন করে।




**চিত্র ১.৩ :** ডিসেম্বর ২, ১৯৮২ : বার্নি ক্লার্কের দেহে ইতিহাসে প্রথমবারের মত যান্ত্রিক হৃৎপিন্ড সংস্থাপন।

আশির দশকের প্রথম দিকে জেমি ফিস্কের 'জীবন প্রাপ্তি'র উদাহরণটি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে পাঠকদের কাছে। এগারো মাসের শিশু জেমি আর হয়ত বড়জোর একটা ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারত-তার জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ যকৃৎ নিয়ে। তার বাঁচবার একটিমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা নির্ভর করছিল যদি কোন সুস্থ শিশুর যকৃৎ কোথাও পাওয়া

যায় আর ওটি ঠিকমত জেমির দেহে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এতো ছোট বাচ্চার জন্য কোথাওই কোন যকৃত পাওয়া যাচ্ছিলো না। যে সময়টাতে জেমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছিলো আর মৃত্যুর থাবা হলুদ থেকে হলুদাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা দেহে, ঠিক সে সময়টাতেই হাজার মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে এক বিচ্ছিরি ধরণের সরক দূর্ঘটনায় পড়া দশ মাসের শিশু জেসি বেল্লোনকে হুড়াহুড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যদিও মাথায় তীব্র আঘাতের ফলে জেসির মস্তিষ্ক আর কাজ করছিলো না, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংগপ্রত্যংগগুলোকে কিন্তু রেস্পিরেটরের সাহায্যে ঠিকই কর্মক্ষম করে রাখা হয়েছিলো। জেসির বাবা রেডিওতে দিন কয়েক আগেই একটি যকৃতের জন্য জেমির অভিভাবকদের আর্তির কথা শুনেছিলেন। শোকগ্রস্ত পিতা এতো দুঃখের মাঝেও মানবিক কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করেননি। তিনি ভেজিটেশনে চলে যাওয়া নিজের মেয়ের অক্ষত যকৃৎটি জেমিকে দান করে তাকে বাঁচনোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেসির রেস্পিরেটর বন্ধ করে দিয়ে তার যকৃৎ সংরক্ষিত করে মিনেসোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। জেমির বহু প্রতীক্ষিত অস্ত্রপ্রচার সফল হলো। এভাবেই জেসির আকস্মিক মৃত্যু সেদিন জেমি ফিস্ককে দান করল যেন এক নতুন জীবন। সেই ধার করা যকৃৎ নিয়ে পুনর্জ্জীবিত জেমি আজো বেঁচে আছে- পড়াশুনা করছে, দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে পার করে দিয়েছে জীবনের চব্বিশটি বছর!

এবার আসুন প্রিয় পাঠক - আপনাদের জিমি টন্টলিউজের ঘটনাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এক শুভ্র সকালে তরুণ জিমি লেক মিশিগানের উপর দিয়ে স্কেট করতে গিয়ে একস্তর পুরু বরফের আস্তরণ ভেদ করে হিমশীতল জলে তলিয়ে যায়। ও অবস্থাতেই ছিল সে অনেকক্ষণ। প্রায় আধাঘন্টা পরে পথচারীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। দেখে মনে হচ্ছিল জিমি মারাই গিয়েছে বুঝি, তার হৃৎস্পন্দন, নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রুষার শুরু করার প্রায় একঘন্টা পরে ছেলেটির দেহে যেন জীবনের বৈশিষ্ট্য আবারো 'নতুন করে' ফিরে আসতে শুরু করলো। আসলে ঠান্ডা পানির তীব্র ঝাপ্টা জিমির দেহকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছিলো। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন এবং ফুসসুসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংগপ্রত্যংগগুলো কিন্তু একটি 'মিনিমাম লেভেলে' কাজ করে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তিটুকুই জিমির দেহে পুনরায় হৃৎস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য ছিলো যথেষ্ট। চিকিৎসকরা একমত যে, বরফ শীতল ঠান্ডা পানি অনেকক্ষেত্রেই ক্লোরফর্মের মত অবচেতকের কাজ করে। আর তাই এ ধরণের পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েও বেঁচে যাবার উদাহরণ কিন্তু জিমি একা নয়। লস ভেগাসের মুরে ব্রাউন আধাঘন্টা কিংবা উতাহ শহরে মিশেল ফাঙ্ক একঘন্টা ধরে বরফ-জলে ডুবে অচেতন হয়ে থাকবার পরও চিকিৎসকরা তাদের কিন্তু বাঁচাতে পেরেছেন।



**চিত্র ১.৪:** মিশেল ফাঙ্কঃ  বরফ জলে দীর্ঘক্ষণ (৬৬ মিনিট) ডুবে থেকেও বেঁচে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড ; (ক) তার আড়াই বছর বয়সের ছবি (খ) এখনকার ছবি

এবারে আসি মৃত্যুক্ষণের আলোচনায়। রোগীর মৃত্যুর 'সঠিক' সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিন্ড ১৫ মিনিট, কিডনী ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশী - ৬ ঘন্টা। অংগ বেঁচে থাকার অর্থ হল তার কোষগুলো বেঁচে থাকা। কোষ বেঁচে থাকে তৎক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির যোগান থাকে। শক্তি উৎপন্ন হয় কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হলে কোষেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরের শেষ কোষটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

## প্রাণের বৈশিষ্ট্য :

মৃত্যুর ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। এবার তাহলে আবারো সেই পুরোন সমস্যায় ফিরে যাই। জীবনের বৈশিষ্ট্য তবে আমরা কাকে বলব? এটা তো নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার নেই যে, জীবিত দেহে সত্যই প্রাণ শক্তির এক ধরণের স্ফুরণ আছে, যার মাধ্যমে জীবদেহ অর্জন করে এক ধরনের 'স্বায়ত্তশাসন' (autonomy); এটিই বোধ হয় জড়জগৎ থেকে জীবকে পৃথক করে দেয়।  এই স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারটা মানুষ থেকে শুরু করে তিমি মাছ পর্যন্ত সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার মধ্যেও 'নিজের মত করে কাজ করার' এক ধরণের প্রবণতা আছে, তা যতই সীমাবদ্ধ আকারে হোক না কেন। কিন্তু মুশকিল হল, ঠিক কোন মহেন্দ্রক্ষণে জীবের কাঁধে ওই 'স্বায়ত্তশাসনের ভুত' সওয়ার হয়ে প্রাণের স্পন্দন ঘটায় তা এখনও বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পল ডেভিস বলেন (Davies, 2003) :

> 'This property of autonomy, or self-determination, seems to touch on the most enigmatic aspect that distinguishes living from non-living things, but it is hard to know where it comes from. What physical properties of living organisms confer autonomy upon them? Nobody knows.'

তবে সবাই যে এ ধরণের নেতিবাচক মতামতের সাথে একমত তা নয়। আসলে বহু বিজ্ঞানীই মনে করেন যে প্রাণের 'মূহূর্ত', 'মহেন্দ্রক্ষণ' এ সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার খোঁজার চেষ্টা আসলে আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত (ধর্মীয়) বিশ্বাসের ফল। ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে ঈশ্বর কিভাবে কোন এক শুভ ক্ষণে আমাদের পৃথিবী এবং পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করেছিলেন। এই ধরনের বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, প্রাণের উৎস নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গিয়েও অনেকে এ ধরণের বিশ্বাস থেকে বেরুতে পারেন না, ফলে চিন্তাধারা ঘুরপাক খেতে থাকে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল থেকে উঠে আসা এক বেঁধে দেওয়া ছকে। মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সটিটিউট ফর মলিকিউলার এন্ড সেলুলার ইভলুশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞানী সিডনী ফক্স (প্রয়াত) এ ধরনের আবদ্ধ চিন্তাকে অভিহিত করেছেন 'channeled thinking in science' হিসেবে। তার মতে, প্রাণের উৎস নিয়ে গবেষনায় ব্রতী অনেককেই এমন সমস্ত প্রশ্ন করতে দেখা যায় যার সাথে আসলে বিজ্ঞান নয়, ধর্মীয় কাহিনীর সাযুজ্যই থাকে বেশী। পাশ্চাত্য বিশ্বে তো বটেই, এমনকি বস্তুবাদের ধারক তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়াতেও এ ধরনের ভাবধারার কমতি ছিল না। তিনি বলেন (Fox, 1988) :

> 'Much of the thinking on the subject of how life began has been channeled, for example by mythological concepts. Even scientists, including those living in an officially atheistic state, such as Oparin's Soviet Union, appear to be influenced by thinking of the past.'

প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে সঠিক প্রশ্নটি করতে হলে 'চ্যানেল্ড থিঙ্কিং' থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে রাসায়নিক বিবর্তন প্রক্রিয়াটি ভাল মত বোঝা দরকার। জানা দরকার জীবনের রসায়নের চরিত্রটি। এ নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আর কি ভাবে ধাপে ধাপে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অজৈব পদার্থ থেকেই রাসায়নিক বিবর্তনের ক্রমধারায় এক সময় জীবনের উন্মেষ ঘটতে পারে তা আলোচিত হয়ছে তৃতীয়, চতুথ ও পঞ্চম অধ্যায়ে। বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতাটি স্পষ্ট হলেই বোঝা যাবে যে প্রাণের উন্মেষ, কিংবা 'স্বায়ত্তশাসন'- যাই বলা হোক না কেন, এগুলো কোনটিই আসলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা

নয়। কিন্তু সরাসরি সেখানে যাওয়ার আগে প্রাণের দাবীদার অন্যান্য 'বৈশিষ্ট্য'গুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

*প্রজনন (পুনরুৎপাদন):* জীবিত সত্তার প্রজনন অথবা পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা থাকবে- এটাই সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু শুধু এ বৈশিষ্ট্য দিয়ে কি জীবকে সত্যই চেনা যায়? যায় না। কারণ অনেক জড় পদার্থেরই (যেমন crystal, bush fire) এক অর্থে পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা রয়েছে। অথচ, ভাইরাস (যাকে অনেকেই 'সজীব' হিসবে বিবেচনা করেন) কিন্তু পুনরুৎপাদন করে বিস্তৃত হতে পারে না। খচ্চর নামের প্রাণীটিকে কেউই জড় পদার্থ হিসেবে গন্য করবে না। নিঃসন্দেহে এটি সজীব, অথচ, খচ্চরের যে প্রজনন ক্ষমতা নেই তা কিন্তু আমরা জানি। একটি সফল প্রজননের ক্ষেত্রে সন্তান পিতামাতার বৈশিষ্ট্যই শুধু পায় না, সেই সাথে অর্জন করে পুনরুৎপাদন করার উপকরণ এবং পুরো প্রক্রিয়াটিও। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াতেই জীবের প্রতিরূপায়ন (replication) ঘটে; আর বংশগতির বাহক জিন পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, জিনগুলোর মধ্যেও প্রতিরূপায়ন ঘটে।

*বিপাক ক্রিয়া:* কেউ নিজেকে 'সজীব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে তার কিন্তু অনবরত কাজ করে যেতে হয়। প্রতিটি জীবদেহই জটিল কিছু বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের রূপান্তর ঘটায় আর এর মাধ্যমে চলাফেরা, প্রজননসহ বিভিন্ন কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যয় করে থাকে। রাসায়নিক পদার্থের রূপান্তর বা প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে শক্তির এই ব্যয়কে বিপাক ক্রিয়া (metabolism) নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু স্রেফ 'মেটাবলিজম' মানেই জীবন নয়। কিছু অনুজীব আছে যারা দেহের অতি জরুরী কিছু কার্যপ্রণালীকে সাময়িক সময়ের জন্য একেবারে বন্ধ করে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের তো আমরা 'মৃত' বলতে পারি না। কারণ প্রয়োজন পড়লে তারা আবার বিপাক ক্রিয়া ফিরিয়ে এনে 'জীবিত' হয়ে উঠতে পারে।

*পুষ্টির যোগান:* এটা অনেকটা বিপাক ক্রিয়ার সাথেই সম্পর্কিত। না খেতে পারলে কোন জীবদেহই বেঁচে থাকতে পারে না। খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে জীবদেহ শক্তি সঞ্চয় করে যা পরে তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে। মানুষের মত প্রাণীরা খাওয়ার জন্য সাহায্য নেয় হাত মুখ নখ, দাঁত

পাকস্থলীর, উদ্ভিদেরা নেয় সালোক-সংশ্লেষণ নামের একটি প্রক্রিয়ার। এর ফলে পদার্থ এবং শক্তির এক নিয়ত প্রবাহ ঘটে। কিন্তু স্রেফ পদার্থ এবং শক্তির প্রবাহ দিয়েই জীবনকে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বৃহস্পতি গ্রহের বুকে যে লাল দাগগুলো দেখা যায় তা কিন্তু পদার্থ এবং শক্তির নিয়ত প্রবাহের মাধ্যমে ঘটা এক ধরণের প্রবাহ-ঘূর্ণি (fluid-vortex) ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কেউ বলবে না যে ওগুলো জীবিত। উপরন্তু, জীবনের জন্য শক্তি প্রয়োজন - এ ব্যাপারটাও বোধ হয় ঢালাওভাবে সত্যি নয়; যেটি প্রয়োজন তা হল 'ব্যবহার উপযোগী' বা 'মুক্ত' শক্তি। এ নিয়ে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

*জটিলতা:* জীবন জিনিসটা যে ভয়ানক রকমের জটিল এ নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এমনকি সামান্য যে ব্যাকটেরিয়া - এর মত এক কোষী জীবের গঠন আর কর্মকান্ডেও জটিলতার কোন কমতি নেই। বস্তুতঃ এই জটিলতাই জীবদেহকে করে তুলেছে জড় জগৎ থেকে আলাদা আর জীবন প্রবাহকে করে তুলেছে 'অনিশ্চিত'। কিন্তু তারপরেও স্রেফ জটিলতা দিয়ে কি জীবনকে ব্যাখ্যা করা যাবে? কক্সবাজারের উপকূলে ধেয়ে আসা হারিকেনের প্রকৃতিও তো জটিল, তার চেয়েও জটিল আমাদের গ্যালাক্সি 'আকাশ গঙ্গা'। এগুলো কোনটিই জীবিত নয়। পদার্থবিদেরা প্রায়শঃই কোয়ান্টাম জগতের জটিলতাকে বিশৃঙ্খল (chaotic) হিসেবে চিহ্নিত করেন; কোয়ান্টম ফ্লাকচুয়েশন, আনবিক পরিবৃত্তি কিংবা নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মত ঘটনাগুলো এতই 'জটিল' যে এগুলোকে কোন নিয়ম বা কার্য-কারণের মধ্যে ফেলে আগাম কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তারপরেও তো সেগুলো জীবিত নয়।

*সংগঠন:* হয়ত আলাদা ভাবে জটিলতার কোন অর্থ নেই, যতক্ষণ না এটি 'সাংগঠনিক জটিলতা'য় রূপ নেয়। জীবদেহের অংগ-প্রত্যংগ-উপাংগগুলো একসাথে সমন্বিত ভাবে কাজ না করতে পারলে জীবনের কোন অর্থ হয় না। আমাদের শরীরের ভিতরে থাকা রক্তবাহী শিরা আর ধমনীগুলো যতই প্যাঁচানো আর জটিল হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত হয়ে রক্তসঞ্চালণে অংশ নেয়, আলাদা কোন ভূমিকা দাবী করতে তো পারে না। আমাদের দু'পায়ের আলাদা ভাবে চলাফেরা করার ক্ষমতারও কোন গুরুত্ব থাকবে না যদি না সেগুলো একে অপরের সাথে সমন্বিত হয়ে হাঁটা চলায় সুবিধা দিতে পারে। সমন্বিত করার পুরো ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণে আমাদের 'জটিল' মস্তিস্কের ভূমিকা তো আছেই।

এমনকি সাধারণ এককেটি কোষেও এই ধরণের সমন্বয় ও সহায়তার যে নমুনা পাওয়া যায় তা রীতিমত বিস্ময়কর। কিন্তু তারপরও এই সমন্বয়ই কিন্তু জীবন নয়। কারণ সমন্বয়ের ব্যাপারগুলো জড়জগতেও বিরল নয়। বহু ক্ষুদ্র অণুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে নিজস্ব ধর্মানুযায়ী সংগঠিত হয়, এমনকি তৈরী করে জটিল নক্সার কাঠামো পর্যন্ত। প্রকৃতিতে এ ধরণের স্ব-সংগঠন (self-organization)-এর বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।

*বৃদ্ধি ও বিস্তার:* প্রতিটি জীবেরই বৃদ্ধি ঘটে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বিস্তৃত হয়। কিন্তু তেমন বৃদ্ধি এবং বিস্তার তো জড় পদার্থের মধ্যেও দেখা যায়। লোহার টুকরা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় ফেলে রাখলে তাতে মরিচা ধরে আর সময়ের সাথে সাথে সেই মরিচার বৃদ্ধি বিস্তার সবই ঘটে। লবনের দানায় কেলাস তৈরী কিংবা সন্ধ্যার আকাশে মেঘের বিস্তার - এগুলো তো আমাদের চোখের সামনেই দেখা। তবে তারপরেও বলতেই হবে যে, জীবজগতে বৃদ্ধি ও বিস্তারের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এ পৃথিবীতে প্রাণের যে নান্দনিক বিকাশ ও বিস্তার তা ঘটেছে বিবর্তনের ক্রমধারায়। অবশ্যই জীবজগতের ভিতর প্রকারণ (variation) থাকাটা এর পিছনে মূল চাবিকাঠি। এই প্রকারণ বজায় রেখে প্রতিরূপায়ন (replication) ঘটিয়ে জীবজগতে ডারউইনীয় পদ্ধতিতে বিবর্তন ঘটে চলেছে অনবরত। জীবের বৃদ্ধি আর বিকাশকে এই প্রেক্ষাপটে ফেলেই আমাদের বিচার করতে হবে। শুধু বৃদ্ধি কিংবা বিস্তার কেন জীবনের সংজ্ঞাই হয়ত এই কাঠামোর মধ্যে ফেলে ঢেলে সাজানো সম্ভব - 'যদি ডারউইনের দেখানো পথে কোন কিছুর বিবর্তন ঘটে, তাকে আমরা সেটিকে জীবিত হিসেবে গণ্য করতে পারি'।

*তথ্যের সমাহার :* সাম্প্রতিক কালে অনেক বিজ্ঞানী কম্পিউটারের সাথে জীবনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার কথা বলছেন। তাঁরা বলেন, জীবের প্রতিরূপায়ন ঘটানোর জন্য 'প্রয়োজনীয় তথ্য' জিনের মাধ্যমে বাবা মা থেকে সন্তান সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়। সে হিসেবে জীবনকে তথ্যের সমাহার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তারপরও, শুধু তথ্য থাকাটাই সব নয়। জঙ্গলে গাছ থেকে অনবরত পাতা ঝরে পড়ার মধ্যেও তো অনেক 'তথ্য' লুকানো আছে। তথ্য আছে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলিকনার মধ্যেও। কিন্তু আমাদের কাছে সে সমস্ত তথ্যের কোন মানে নেই। জীবনের গতিশীলতা সঠিক ভাবে সংগায়িত হতে হলে তথ্যকে হতে হবে 'অর্থবহ'। আর অর্থবহ হতে হলে আলোচিত সিস্টেমের সাপেক্ষে এর একটি প্রাসঙ্গিকতা (context) থাকতে হবে। অর্থাৎ, মোদ্দাকথা হল, তথ্যকে একটি পরিকাঠামোর মধ্যে বিশেষিত

(specified) হতে হবে। কিন্তু সেই কাঠামোগত প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারটি আসবে কোত্থেকে? আর কিভাবেই বা সেই অর্থবহ ভাবে বিশেষিত হওয়ার ব্যাপারটা প্রাকৃতিকভাবে স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্ভুত হবে?

*হার্ডওয়্যার এবং সফট্‌ওয়্যার :* জীবনের ভিত্তিমূল হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে মূলতঃ দুটি উপাদানকে : নিউক্লিয়িক এসিড (আরএনএ/ডিএনএ) এবং প্রোটিন। এ দুটি উপাদানই রাসায়নিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে অপরের পরিপূরক। শুধু তাই নয় জীবন গঠনে এদের ভুমিকাও খুবই ব্যাপক। নিউক্লিয়িক এসিডগুলো যেন আক্ষরিক অর্থেই কাজ করে জীবনের 'সফট্‌ওয়্যার' হিসেবে। আর অন্যদিকে প্রোটিনগুলো যেন কর্মীবাহিনী যারা গড়ে তুলে শক্ত-পোক্ত হার্ডওয়ারের কাঠামো। এ দুই রাসায়নিক জগতের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এক ধরণের কোডের মাধ্যমে, যাদের আমরা 'জেনেটিক কোড' হিসেবে আভিহিত করি। বিজ্ঞানীরা বলেন, এদুই-ই আসলে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা খুব 'অগ্রসর পণ্য'; হার্ডওয়্যার এবং সফট্‌ওয়্যারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জটিল জীবনের নিয়ামক।

*স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা:* জীবনের গোলকধাঁধার আরেক রহস্য হচ্ছে এটি 'স্থায়িত্ব' ও 'পরিবর্তনশীলতা'র এর অভূতপূর্ব সমন্বয়। এ যেন এক পুরোন দার্শনিক সমস্যা-'থাকা' বনাম'হওয়া' (being versus becomming)-এর মিলন ক্ষেত্র। আমরা জানি জিনের কাজ হচ্ছে প্রতিরূপায়ন ঘটানো, জেনেটিক তথ্যকে সংরক্ষণ করা। কিন্তু প্রকারণ ছাড়া তো জীবের অভিযোজন ঘটতে পারে না, আর অভিযোজিত না হলে জিনও টিকে থাকতে পারে না। কোন কিছু টিকে থাকতে না পারলে ডারউইনীয় পদ্ধতিতেই ঘটে এর বিনাশ। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কিভাবে তাহলে 'সংরক্ষণ' এবং 'পরিবর্তনশীলতা'র মত দুটি 'পরষ্পর বিরোধী' জিনিস একই ব্যবস্থার মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে? নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি বিস্ময়কর। এ ধরনের নানা বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার নিয়েই কিন্তু গড়ে উঠেছে 'রহস্যময়' প্রাণ।

জীবন নিয়ে এত জ্ঞান-গম্ভীর আলোচনার পরও জীবনের সংজ্ঞা আমাদের কাছে স্পষ্ট হল কি? দেখাই যাচ্ছে জড় থেকে জীবকে পৃথক করার পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খুব পরিস্কার নয়। কাজেই প্রাণের এই দুর্গম রহস্য ভেদ করা চাট্টিখানি কথা নয়! সমস্যাটি আরো ভালভাবে বোঝা যাবে যতই আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হব আর পরবর্তী

অধ্যায়গুলোতে ভাইরাস, ভিরইডস এবং প্রিয়ন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে পারব। সত্যি বলতে কি, জড় থেকে জীবকে একটি শক্ত সীমারেখা দিয়ে পৃথক করার চেষ্টাই হচ্ছে প্রকারন্তরে মেনে নেওয়া যে 'প্রাণ' জিনিসটা প্রাকৃতিক কিছু নয় বরং যাদুকরী, অপার্থিব কিংবা অলৌকিক কিছু। কাজেই এ ধরনের পৃথকীকরণ প্রচেষ্টাও হয়ত এক ধরনের দীর্ঘদিনের 'চ্যানেল্ড থিংকিং' ছাড়া কিছু নয়। প্রাণ জিনিসটা কিন্তু এমন নয় যে, ওপর থেকে কিছু খোসা ছাড়িয়ে নিলেই ভিতর থেকে 'সজীব' কোন অণু বেড়িয়ে পড়বে - যেটি জীবনের ভিত্তিমূল। ওভাবে মাটি খুঁড়ে 'জীবন' পাওয়া যাবে না; কারণ এ ধরনের কোন 'সজীব অণু'র কোন অস্তিত্বই আসলে নেই। বরং প্রাণ নামক সজীব অভিব্যক্তিটি গড়ে উঠেছে অসংখ্য নিষ্প্রাণ অণুদের বিভিন্ন সমন্বিত প্রক্রিয়া থেকেই। কিন্তু কি ভাবে?

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৩;
পুনর্লিখন : ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০০৬

---

{প্রথম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# জীবনের প্রাণ রাসায়নিক উপাদান

## (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –২)

অভিজিৎ রায়

*পূর্ব্বর্তী পর্বের পর হতে...*

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি,
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ বা জীবন নিয়ে কেবল প্রাণিবিজ্ঞানী কিংবা জীববিজ্ঞানীরাই যে সবসময় ভেবেছেন তা কিন্তু নয়। প্রাণের গোলকধাঁধার দুর্জ্ঞেয় রহস্য আর মায়াবী মুখচ্ছবি যুগে যুগে পুরোমাত্রায় আলোড়িত করেছে অন্য শাখার বিজ্ঞানীদেরও। আজ হতে প্রায় বাষট্টি বছর আগে নোবেল বিজয়ী অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ অর্ভিন শ্রোডিংগার একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে উচ্চারণ করেছিলেন দুই শব্দের শতাব্দী-প্রাচীন সেই দার্শিনিক পংক্তিমালা - 'জীবন কি' (What is life)? যে সমস্যাটিকে এতদিন ধরে ভাবা হত কেবলই জীববিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সমস্যা হিসেবে, অধ্যাপক শ্রোডিংগার সে সমস্যাটিকে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা দিলেন পদার্থ বিজ্ঞান আর রসায়ন বিজ্ঞানের কিছু নিয়ম কানুন দিয়ে, প্রথমবারের মত। সেই থেকে শুরু। সে সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণগুলো নিয়ে ১৯৪৪ সালে লিখিত What is life? নামের সেই যুগান্তকারী বইটিতে শ্রোডিংগার জীবনকে দেখতে চেয়েছেন এক বিদ্ঘুটে ধরনের 'অনাবর্তী কেলাস' (aperiodic crystal) হিসেবে যার গাঠনিক আকারের বৈচিত্রময় পুনরুৎপত্তি এবং বিবর্ধন ঘটে। তবে জীবন যে কেবল 'অনাবর্তী কেলাস' নয়, বরং এর অভিব্যক্তি যে আরো গভীর - সেটা শ্রোডিংগার নিজেই বুঝেছিলেন আর বলেছিলেন, 'জীবনের জটিলতাকে কেলাসের সাথে তুলনা করা হবে যেন এক নিরস ওয়াল পেপারের সাথে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তিখচিত এক নক্সিকাঁথার তুলনা'!

জীবনকে বুঝবার ক্ষেত্রে শ্রোডিংগারের বইটির অবদান কিন্তু সত্যই ব্যাপক। বইটি লেখার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ডিএনএ'র যুগল সর্পিলের রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী

ওয়াটসন আপ্লুত হলেন শ্রোডিংগার বন্দনায়, খুব স্পষ্ট করেই কিন্তু বললেন, সতেরো বছর বয়সে যদি এই বইটি পড়ার সুযোগ না হত, তবে হয়ত তাঁর জেনেটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহই কখনও সৃষ্টি হত না! বুঝুন কী কান্ড! ঠিক একই ভাবে ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'What Mad Pursuit' বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে শ্রোডিংগারের এই মহামূল্যবান বইটি একসময় তাকে উৎসাহিত করেছিল জেনেটিক্সের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভাবতে।



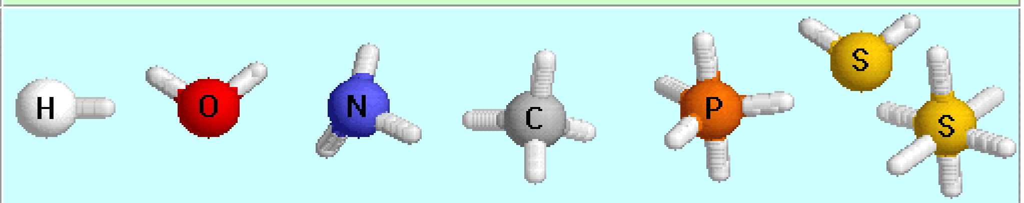
**চিত্র ২.১ :** অর্ভিন শ্রোডিংগার (১৮৮৭-১৯৬১)

তবে বইটির অবদান কেবল ক্রিক-ওয়াটসনকে ডিএনএর রহস্য সমাধানে আগ্রহী করে নোবেল বিজয়ী হতে সহায়তা করা নয়, বরং এর আবেদন অনেক গভীরে। এ বইটিই প্রথমবারের মতো আমাদের বুঝতে শিখিয়েছে যে, জীবনকে জানতে হলে, মূলতঃ জীবনের উৎস সন্ধান করতে হলে শুধু জীববিজ্ঞানী হয়ে বসে থাকলে চলবে না, একই সাথে পরিচিত হতে হবে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার বর্ণাঢ্য জগতের সাথে। সেটিই খুব পরিস্কার করেন আরেক নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর Facing Up : Science and Its Cultural Adversaries গ্রন্থে এভাবে :

> No biologist today will be content with an axiom about biological behaviors that could not be imagined to have a more fundamental level. That more fundamental level would have to be the level of Physics and chemistry, and the contingency that the earth is billions of years old.

ব্যাপারটা খুবই পরিস্কার। প্রাণের উৎসমুখে মানে গোড়ায় কিন্তু ডায়নোসার, বাঘ, ভাল্লুকের মত কোন অতিকায় প্রাণী নেই, নেই আমাদের পরিচিত পৃথিবীর জীবজগতের নানাপদের বৈচিত্র। প্রাণের উৎপত্তির মূলে যা আছে তা খুবই কাঠ খোট্টা-নিষ্প্রাণ কতকগুলো সাদা মাঠা রাসায়নিক পদার্থ! তাই জীবনকে বুঝতে হলে এই কাঠখোট্টা পদার্থগুলো সম্বন্ধে জানা চাই,

ভাল করে বোঝা চাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, জীবনের গঠনকে সাধারণভাবে যত জটিল বলে মনে করা হয়, ততটা জটিল কিন্তু মোটেই নয়, বরং জীবনের প্রাথমিক ভিত্তিমূল অবিশ্বাস্য রকমের সরল। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, জীবনের ভিত্তি তৈরী হয়েছে মাত্র চারটি সাধারণ মৌলিক পদার্থ দিয়ে : কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং নাইট্রোজেন (N); সংক্ষেপে বলে CHON। সালফার আর ফসফরাসকে গোনায় ধরলে মূল উপাদান দাঁড়ায় ছ'টি তে - CHON(SP)। এই উপাদানগুলোকে মাথায় রেখেই মূলতঃ জীবনকে সংগায়িত করার কাজটি আমাদের আরম্ভ করতে হবে, কারণ জন্মের পর থেকেই যে বৈচিত্রময় জীবজগতের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি, তার শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগই কিন্তু তৈরী হয়েছে এই 'খন' (CHON) দিয়ে।

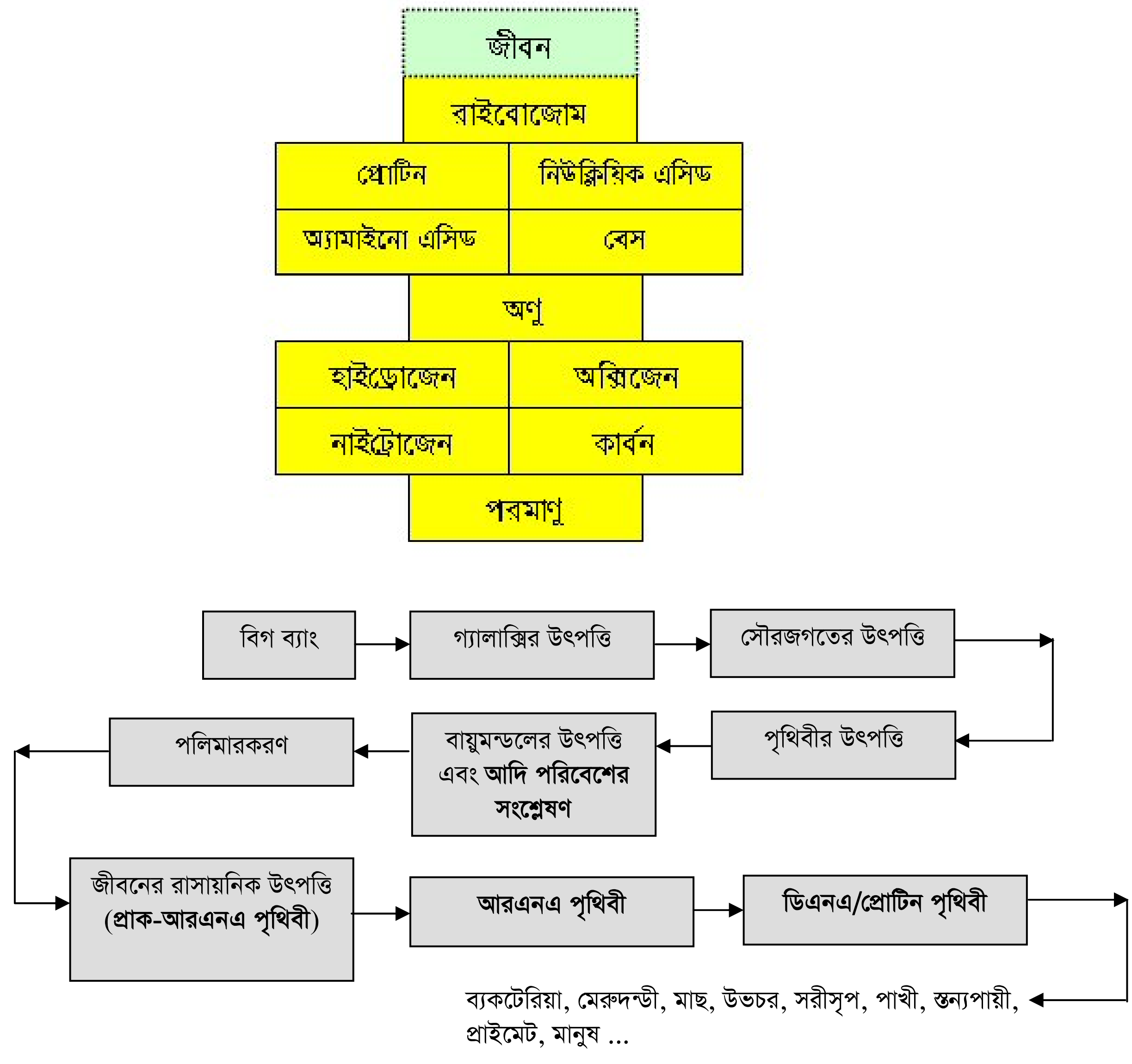
| Atom | Hydrogen | Oxygen | Nitrogen | Carbon | Phosphorus | Sulfur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valence | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2, 6 |
| Model |  | | | | | |



**চিত্র ২.২ :** জীবন গঠনের পেছনে মূল উপাদান - CHON(SP)

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে সব ছেড়ে ছুড়ে এই '*খন*' কেন? কেন লোহা, তামা, সোনা, টাইটেনিয়াম কিংবা ক্রিপটন নয়, কিংবা নয় আর কোন বিজাতীয় সংকর? উত্তরটা কিন্তু সোজা। জীবনের গঠন *খন* দিয়ে শুরু হয়েছে কারণ, প্রকৃতিতে এই উপাদানগুলোর একচ্ছত্র আধিপত্য আর প্রাচুর্য রয়েছে - সেই উৎপত্তির প্রারম্ভ থেকেই। যে পাঁচটি মৌল কণিকা এ বিশ্ব-চরাচরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তার চারটিই হচ্ছে *খন*। অপর মৌলটি হল হিলিয়াম (He)। কিন্তু হিলিয়াম এতোটাই ঘরকুনো, মানে রাসায়নিক ভাবে নিষ্ক্রিয় যে *খন*-এর সদস্যরা হিলিয়ামের সাথে কোন বন্ধুত্বই গড়ে তুলতে পারে নি। কাজেই হিলিয়াম বেচারার এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, ছোট বাচ্চাদের গ্যাস বেলুনের মধ্যে সেঁদিয়ে থাকা ছাড়া জীবনগঠনে তার কোন ভুমিকা নেই। প্রকৃতিতে খন্ বাবাজীর প্রচুর পরিমানে থাকাটাই প্রাণ সৃষ্টির পেছনে একমাত্র কারণ নয়, বরং পাশাপাশি এও দেখা গেছে এরা আবার একে অপরের সাথে মিলে নানা ধরোনের যৌগ উৎপন্ন করতে পারছে- যেমন মিথেন ($CH_4$), কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$), অ্যামোনিয়া ($NH_3$) ইত্যাদি। এ যৌগগুলো যেহেতু আবার পানিতে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে যায়, এগুলো জীবন গঠনের পেছনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পানির ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই হেলাফেলা করবার নয়; কারণ যে কোন জীবদেহে - সে আমাদের মানব দেহই হোক আর কুমড়া কিংবা লেটুস পাতার ডগাই হোক - বিরাট একটা অংশ জুড়ে রয়েছে কেবল পানি আর পানি! জীবদেহের এই জলীয় অংশটা

আসলে সুদূর অতীতে প্রাণের স্পন্দন যে একটা জলজ পরিবেশে ঘটেছে আর বিবর্তিত হয়েছে, তার এক অবশ্যাম্ভাবী সাক্ষী। আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মতরে এই ‘জলীয় তথ্য’ কোষের মধ্যে বহন করে চলেছি। ফলে দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া থেকে ছত্রাক, ছত্রাক থেকে কোলা ব্যাঙ, কোলা ব্যাঙ থেকে তিমি মাছ, কিংবা তিমি মাছ থেকে মানুষ - পৃথিবীতে প্রাণের যে বিস্তৃত পরিসর আমাদের হতবিহ্বল করে মূক করে দেয়, সেটি কিন্তু এক্কেবারেই সরল একটা পর্যায়ে নেমে আসে প্রাণের উৎসমুখে এসে।




**চিত্র ২.৩ :** জীবনের একটি অতি সরল রেখাচিত্র

সেই উৎসমুখে অর্থাৎ প্রাণের রাসায়নিক স্তরে নেমে আসলে দেখা যায়, সমস্ত প্রাণ - তা তিমি মাছেরই হোক, কিংবা মানুষেরই হোক, শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ওই CHON(SP) দিয়ে।

কাজেই নির্দ্বিধায় বলা যায় এই *খন্ই* হল 'জীবন গঠনের' প্রাথমিক ধাপ। এই ধাপের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে পরবর্তী ধাপ গুলো - অ্যামিনো এসিড, চিনি, ডিএনএ, আরএনএ কিংবা অন্যান্য মনোমার। ওগুলোর উপর ভর করেই আবার পরবর্তীতে তৈরী হয়েছে বিভিন্ন পলিমারের অনু যেমন - প্রোটিন, শর্করা কিংবা নিউক্লিয়িক এসিড- এগুলো সবগুলোই কিন্তু জীবন গঠনের নিয়ামক- জীবন সৌধের এক একটি সিঁড়ি; তারপরও একথাও সত্যি যে, এগুলো কোনটাই নিজেরা আলাদা ভাবে 'জীবন' নয়। ব্যাপারটিকে অনেকটা আমাদের মস্তিকের 'চিন্তাশক্তি' অথবা সচেতনার সাথে তুলনা করা যায়। আলাদা আলাদা ভাবে মাথার মধ্যকার লক্ষ লক্ষ নিউরনগুলোর কোনটিই কিন্তু এককভাবে চিন্তা করতে পারে না, কিন্তু এই 'নির্বোধ' নিউরনগুলোই সম্মিলিতভাবে এক ধরণের অভিব্যক্তির জন্ম দেয় যাকে আমরা বলি *কনশাসনেস* বা চেতনা! প্রাণও কিন্তু অনেকটা এরকমই - নিষ্প্রাণদের সমন্বয়ে গড়ে উঠা এক ধরণের সম্মিলিত সজীব অভিব্যক্তি।

প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল যে, জীবন সম্পর্কে যে কোন মৌলিক প্রশ্ন তুলবার আগে জীবনের সনাক্তকরণটি জরুরী। কিভাবে জীবিত ও জড় - এ দুই জাতের পদার্থকে একটা মাপকাঠি দিয়ে আলাদা করা যায়? **বহিরাঙ্গের গঠন** ও **আকৃতি** অবশ্যই একটা মাপকাঠি। তবে বহির্বৈশিষ্টের পাশাপাশি আরও দুটি আচরণ, যেমন অবিকল নকলরূপী ভবিষ্যত তৈরি করা এবং 'উদ্দেশ্যপূর্ণ' অবস্থানকে জীবিতদের গুণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের সংজ্ঞায়ও সমস্যা আছে। সমস্যা হয় ভাইরাসকে নিয়ে, আবার সমস্যা হয় কেলাসকে নিয়ে।

জড় পদার্থের ক্ষেত্রে কেলাস ক্ষুদ্র মাপের কেলাস কণাকে আশ্রয় করে 'জন্ম' নেয়। আবার অনাদরে ফেলে রাখলে কেলাসের জ্যামিতিক অবয়ব বিনষ্ট হয়, যা এক প্রকার 'মৃত্যু'। কেলাসের বৃদ্ধি তো আছেই। কেলাসের কণা তরল দ্রবণের মধ্যে অথবা গলিত পদার্থের মধ্যে তার স্বজাতিকে নির্বাচন করে 'অবিকল নকলরূপী ভবিষ্যতের সৃষ্টি করতে' পারে- ফলে জন্ম নেয় দ্বিতীয় প্রজন্মের কেলাস। এত মিল থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলেই জানি কেলাস জীবিত পদার্থ নয়, কারণ কেলাসের খাদ্য-শোষনের ব্যবস্থা নেই, বিপাক প্রক্রিয়া নেই, নেই আর কোন জটিল শারীরিক প্রক্রিয়া।

আবার ভাইরাসের কথা চিন্তা করা যাক। ভাইরাস জীবিত ও জড়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। ভাইরাসকে কেউ জড় বলতে পারেন, আবার জীবিত বলতেও বাঁধা নেই। এমনিতে ভাইরাস 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। ভাইরাসে থাকে প্রোটিনবাহী নিউক্লিয়িক এসিড। এই নিউক্লিয়িক এসিডই ভাইরাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের আধার।

অনেক বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন আদিমকাল থেকেই জৈববিবর্তনে ভাইরাস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তাই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে ভাইরাসকে বোঝা চাই। নিউক্লিয়িক এসিড বা প্রোটিন এরা কেউ জীবিত নয়, এরা জীবনের উপাদান। নিউক্লিয়িক এসিড ও প্রোটিনের সমন্বয়ে যে ভাইরাসকেন্দ্র গড়ে ওঠে তাও জীবিত নয়, যতক্ষণ না তারা নিজের পুনরুৎপাদন করছে। একমাত্র যখন ভাইরাস দখলকৃত কোষকে আশ্রয় করে বংশবিস্তার করতে পারে তখনই কেবল ভাইরাসকে 'জীবিত' বলা যেতে পারে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, কতকগুলো প্রোটিনের সমন্বয়ই প্রাণ নয়, প্রাণ হচ্ছে 'কাজের সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি'। এই সক্রিয় অভিব্যক্তিই আসলে জীবনের ভিত্তি। প্রোটিনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে জীবিতদের দেহে। *জীবিত বস্তু আসলে ঠিক ততক্ষণ জীবিত যতক্ষণ এর ভিতরে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে।* জে.বি.এস হলডেনের ভাষায়,

> "Any self-perpetuating pattern of chemical reaction, might be called alive."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শরীরের কতটা জীবিত আর কতটা নয়? বৃহৎ প্রাণিদেরদের ক্ষেত্রে হয়ত এই পরিমাপের একটা অর্থ আছে কিন্তু ছোটদের ক্ষেত্রে তেমনভাবে নেই। জীবিত বস্তু যত সরল, তত বিস্তৃত এর জীবন। এককোষী অ্যামিবাকে ছিন্ন করে দু'ভাগ করলে দেখা যায় প্রতিটি ভাগের ক্ষমতা আছে নতুন জীবন 'তৈরি' করার, যদি প্রতিটি ভাগেই নিউক্লিয়াসের অংশ থাকে। এ থেকে নিউক্লিয়াসের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সাইটোপ্লাজমকে বাদ দিয়ে শুধু নিউক্লিয়াস কি পারবে নতুন অ্যামিবার জন্ম দিতে? না, পারবে না। *অতএব নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম- এককথায় একটি পরিপূর্ণ জীবনকোষই পারে নতুন জীবনের জন্ম দিতে। কাজেই কোষই হচ্ছে জীবনের ক্ষুদ্রত্তম আধার।* এখন কোষকে জীবনের ক্ষুদ্রত্তম আধার ঘোষণা করায় ভাইরাসবাদীরা হয়ত আপত্তি করবেন। তারা বলতে পারেন, শুধু 'নিউক্লিয়িক এসিড' নিয়ে 'বেঁচে থাকা' ভাইরাসরা তো জীবিত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, ভাইরাসের 'বেঁচে থাকা' সম্ভব হয় যখন সে হাতের কাছে ভর করার মত ভিন্ন 'জীবিত' কোষের সাইটোপ্লাজম পায়।

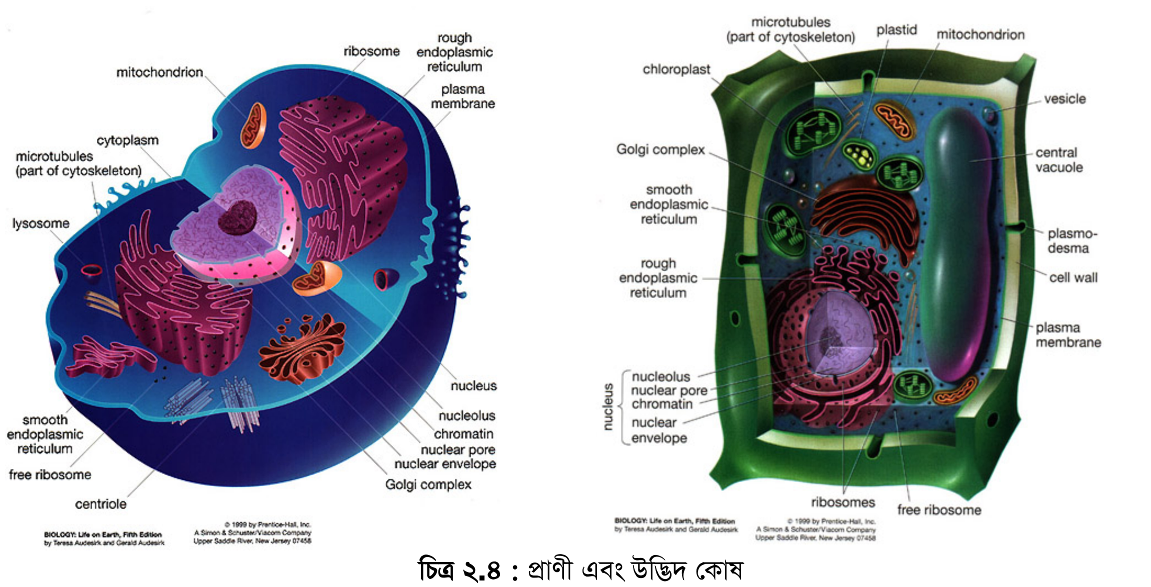
আসলে জীবনের সংজ্ঞার চেয়ে জীবিত বস্তুর সংজ্ঞা অনেক বেশী সহজলভ্য। ১৮৫৮ সালের কোষ মতবাদ থেকে জীবিত বস্তুর সংজ্ঞায় পৌঁছুতে পেরেছি আমরা। উইলিয়াম কিটোনের Biological science-এর সংজ্ঞাটি হল ঃ

Living things are chemical organizations compared of cells and capable of reproducing themselves ('জীবিত বস্তু কোষ নির্মিত রাসায়নিক পদার্থ যা পুনরুৎপত্তির ক্ষমতা রাখে'।) এই সংজ্ঞানুসারে জীবিত বস্তুর দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলঃ

১) এটি হতে হবে কোষ নির্মিত
২) তার পুনরুৎপত্তির ক্ষমতা থাকবে (অর্থাৎ কোষ থেকে কোষ উৎপন্ন হবে)

কিন্তু ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী মার্টিনাস বেইজারনিক ১৮৮৯ সালে এবং ১৮৯২ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী দমিত্রি ইভানোবস্কি ভাইরাস আবিস্কার করলে এই কোষ মতবাদের প্রথম প্রতিপাদ্য ভেঙ্গে পড়ে। রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডবলিউ. এম. স্ট্যান্‌লি ১৯৩৫ সালে দেখিয়েছিলেন যে, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া এক নয়। তিনি তামাক-মোজাইক ভাইরাসের কেলাস তৈরী করলেন। বোঝার কোন উপায়ই নাই যে, কেলাসগুলো জীবিত বস্তু। অকোষীয় বস্তুটিতে কোন বিপাক নেই। কিন্তু তামাক গাছে প্রবেশ করিয়ে দিলে দেখা গেল তারা বিভাজিত হয়ে রোগের উৎপত্তি ঘটাচ্ছে। ভাইরাসের জীবনকে মেনে নিলে জীবনের সংজ্ঞায়ন করতে হয় অনেক ব্যাপক পরিসরে। অকোষীয় (acellular) এবং কোষীয় (cellular) - এ দু ধরনের জীবন বা জীবকে মেনে নিতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে জীবনের নবতর সংজ্ঞায়ন জরুরী হয়ে পড়ে। বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ ও জীববিদ জে ডি বার্ণাল (১৯৫১) জীবনের সংজ্ঞায়ন করেন এভাবে :

> *'একটি নির্দিষ্ট আয়তন বা স্থানের মধ্যে স্বচালিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম জীবন'*। তিনি আরো বললেন, *'জীবন হচ্ছে এক অতি জটিল ভৌত রাসায়নিকতন্ত্র যা একগাদা সুসংহত বা একীভূত ও স্বনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক ও ভৌত বিক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরিপার্শ্বের বস্তু ও শক্তিকে স্বীয় বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করে।'*




**চিত্র ২.৪ :** প্রাণী এবং উদ্ভিদ কোষ

মূলতঃ পঞ্চাশের দশকের পর হতে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে জীবনের পরিচয়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য বলে মানা হচ্ছেঃ

ক) নিজের প্রতিলিপি তৈরী করা
খ) মিউটেশন ঘটনোর ক্ষমতা
গ) ডারউইনীয় বিবর্তন।

কোষীয় ও অকোষীয় নির্বিশেষে জীবের একটি রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে উক্ত তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জীবনের মুল উপাদানটি নিউক্লিয়িক এসিড (মুলতঃ ডিএনএ / আরএনএ)। এটি জড় বস্তু হলেও নিজের অনুলিপি তৈরী করে ও বেস অনুক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়ে বিরল মিউটেশন ঘটায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে ডিএনএ জড় বস্তু হলেও তাতে জীবনের দুটি মৌলিক লক্ষণ প্রকাশিত। কিন্তু তারপরও কোষের সাহায্য ছাড়া ডিএনএ একা দুটি কাজ করতে পারে না। এনজাইম হচ্ছে প্রোটিন। সুতরাং ডিএনএ এবং প্রোটিনের উৎপত্তি জীবনের উৎপত্তির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

জীবনের উৎপত্তি কোথা থেকে - এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি জীবনের প্রারম্ভ ঘটে জীবন থেকেই, জীবনই তৈরি করে পরবর্তী প্রজন্মকে; কিন্তু ধারণা করা হয় যে 'প্রথম জীবন' জন্ম নিয়েছিল অজৈব পদার্থ থেকে। জীবন যদি অজৈব পদার্থ থেকে জাত হয় তাহলে কোন অংশে এই উল্লম্ফন ঘটল তা জানা চাই। কী সেই মৌলিক কারণ এবং পরিবেশ যা নিষ্প্রাণকে একদিন প্রাণে পরিণত করল? পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে।

প্রথম প্রকাশ : ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৩
পুনর্লিখন : ৫ মার্চ, ২০০৬

---

{দ্বিতীয় অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# জীবনের উদ্ভবের সম্ভাব্য ধারণাগুলো

## (প্রানের প্রান জাগিছে তোমারি প্রানে –৩)

অভিজিৎ রায়

পূর্ব্বর্তী পর্বের পর হতে...

চারিদিকে শান্ত বাতি ভিজে গন্ধ-মৃদু কলরব;
খেয়া নৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;-
এশিরিয়া ধুলো আজ ব্যাবিলন ছাই হ'য়ে আছে।
–জীবনানন্দ দাশ

জীববিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল -'কি ভাবে, কখন আর কোথায় প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হল?'। এ প্রশ্নগুলো জীববিজ্ঞানের চিরন্তন এবং মৌলিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, প্রাণিবিজ্ঞানী, রসায়ন বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী সবাই বরাবর হিমসিম খেয়েছেন। এমন কি ডারউইন নিজেও একসময় বলেছিলেনঃ 'বর্তমানকালে জীবনের উৎপত্তি নিয়ে ভাববার মত বাজে কাজ আর কিছুই নেই, তার চেয়ে বরং বস্তুর উৎপত্তি নিয়ে ভাবা যেতে পারে' (It is mere rubbish thinking at present of the origin of life; one might as well think about the origin of matter)। এর কারণ হল জীবনের উৎপত্তিসূচক প্রশ্নগুলো শুনতে যত সহজ সরল শোনায়, এ গুলোর সমাধান কিন্তু এত সোজা নয়; এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্তর্নিহিত নানা জটিলতা। তারপরেও মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন বসে থাকে নি। আজানাকে জানবার আগ্রহে উত্তর খুঁজে নিতে চেয়েছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু জীবনের 'গোলোকধাঁধা'র সমাধান তো এত সহজ নয় যে 'জলবৎ তরলং' এর সমাধান পেয়ে যাবে, যদিও মানুষ কিন্তু প্রতিনিয়তই আশাবাদী। এ প্রসঙ্গে জেডি বার্ণলের উক্তিটি স্মর্তব্য ঃ

> Life is beginning to cease to be a mystery and becoming practically a cryptogram, a puzzle, a code that can be broken, a working model that sooner or later can be made.

বার্নাল এ উক্তিটি করেছিলেন ১৯৬৭ সালে; এর পর কয়েক দশক পার হয়ে গেছে। তারপরও জীবনের সঠিক সংজ্ঞা আর উৎপত্তির ইতিহাস সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে কি? আসলে জীবনের উৎপত্তিকে বুঝতে হলে জড় জগতে আর জীবজগতে বিবর্তনকে খুব ভালভাবে বোঝা ছাড়া গতি নেই। জড় জগতে বিবর্তন বলতে আমি মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে বুঝাচ্ছি। আজ থেকে মোটামুটি সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। কিভাবে মহাবিস্ফোরণ থেকে শুরু করে প্রথমিক কনিকার উৎপত্তি, তারপর ধীরে ধীরে এক সময় শক্তির প্রাধান্য অতক্রম করে শুরু হল পদার্থের প্রাধান্য, সেই থেকে শুরু করে তারামন্ডল, কোয়েসার, ছায়াপথ, সূর্য, সৌরজগৎ, সবকিছু পার হয়ে কিভাবে অবশেষে আমাদের এ পৃথিবীর জন্ম হল তার একটি পর্যায়ক্রমিক ধারণা প্রথম গ্রন্থকার তার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটিতে (অঙ্কুর প্রকাশনী; ২০০৫, ২০০৬) দিতে চেষ্টা করেছে। উক্ত বইটিকে জড়জগতে বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হিসেবেও ধরা যেতে পারে। তবে জড়জগতে বিবর্তনই কিন্তু সবটুকু নয়। প্রাণের উৎপত্তি আর জীবজগতে বিবর্তনের ইতিহাসটা না তুলে ধরলে গল্পটি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। বাস্তবে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে তা হল :

**জড় জগতে বিবর্তন –> প্রাণের উৎপত্তি –> প্রজাতির উৎপত্তি –> মানুষের উৎপত্তি**

তবে এ বইটিতে আমাদের আলোচনা মূলতঃ প্রাণের উৎপত্তির বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সেই সাড়ে চারশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী কিন্তু কোন দিক দিয়েই আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। তখন পৃথিবীতে কোন প্রাণ ছিল না। পৃথিবী ছিল প্রচন্ড উত্তপ্ত, আর আকাশ আর পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল বিষাক্ত গ্যাসে। তারপর একসময় অনেককিছুর বদল হল, পৃথিবীও একসময় বারিধারায় শীতল হল। এমনি এক পরিস্থিতিতে এককোষী জীবের উদ্ভব ঘটল। তবে ঠিক কোন মহেন্দ্রক্ষণে এককোষী জীবের উৎপত্তি আর তারপর সেই আনন্দধারা ক্রমাগত বহুকোষে ছড়িয়ে দিয়ে সবুজ গাছপালাকে আন্দোলিত করেছে, কিংবা পাখির কূজনে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছে তা আর আজ হলফ করে বলা যবে না। এ পৃথিবীতে জীবনের প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে অনেক অনুকল্প আছে। এগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮) :

১) ***অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা :*** জীবনের আবির্ভাব হয়েছে অতিপ্রাকৃতিক (supernatural) ও অজ্ঞেয় ঘটনা হিসেবে।

২) ***সৃষ্টিবাদ :*** বিশেষ লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে, বিরাট কোন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জীবনের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর নাম সৃষ্টিবাদ বা বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্ব (Theory of special creation)।

৩) ***স্বতঃজননবাদ :*** স্বতঃস্ফুর্তভাবেই ময়লা-আবর্জনা থেকে প্রাণের সৃষ্টি হয়। এধারণাকে বলে স্বতঃজনন তত্ত্ব (Theory of spontaneous generation)।

৪) ***বহির্জগতে উৎপত্তি :*** এ ধারণা অনুযায়ী জীবন পৃথিবীর বহিস্থঃ (Extra terrestrial) পরিবেশ থেকে। ধারনা করা হয় পৃথিবীর  বহির্জগতে কোথাও না কোথাও প্রাণ চিরকালই ছিল, আর সেখান থেকেই পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে।

৫) ***জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব :*** রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আদিম পরিবেশে অজৈব (জড়) বস্তু হতে পৃথিবীতেই জীবনের উৎপত্তি হয়েছে।  এই তত্ত্বের নাম জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Chemical theory of origin of life)। এ তত্ত্বের অপর একটি নাম অজীবজনি (Abiogenesis)।

প্রথমোক্ত দুটি অনুকল্প বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। এই তত্ত্ব দুটি আসলে মনে করে বিশাল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঈশ্বর পৃথিবীতে একসময় প্রাণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই তত্ত্বগুলোর কোন অবরোহ বা অনুসিদ্ধান্ত নেই, কিংবা থাকলেও তা পরীক্ষা, নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাচাই করা যয় না।  তবে ৭ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদের যে ব্যাখ্যা ফাদার সুয়ারেজ দিয়েছেন বা সৃষ্টি মুহূর্তের তারিখ হিসেবে আর্চ বিশপ উশার যা বলেছেন (সকাল ৯-৩০, মঙ্গলবার, ২০০৪ খ্রীঃ পূ) তাকে বিজ্ঞান সঠিক মনে করে না।  প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ফসিলাদি পর্যবেক্ষণ করে এবং অন্যান্য পরীক্ষার সাহায্যে তাঁদের ধারণার অসারতা প্রমাণিত হয়।  আর তাছাড়া বিজ্ঞান অজ্ঞেয়বাদী নয়। বিজ্ঞান খুব কঠোরভাবেই বস্তুবাদী।  প্রাণের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতেই বিজ্ঞান জানতে চায়। আধুনিক বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছে যাদের হাত দিয়ে তারা মধ্যযুগীয় ভাববাদ আর অজ্ঞেয়বাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। বেকন, দেকার্ত, নিউটন, গ্যালিলিও, কেপলার মিলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সংস্কৃতি গড়েছেন, যন্ত্রসভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। পরে বিকশিত হয়েছে রসায়নবিদ্যা আর তার সাথে সাথে জীববিদ্যা। কিন্তু প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে

কোন সঠিক ধারণা তখনও মানুষের মনে ছিল না। 'নিম্ন'শ্রেনীর প্রাণী যেমন কীট পতংগ স্বতঃস্ফুর্তভাবে মাটি, কাদা ময়লা আবর্জনা থেকে জন্ম নেয় - এই বিশ্বাস প্রাচীন চীন, ভারত আর মিশরে আমরা দেখতে পাই। এর কারণও ছিল। আবর্জনা কাদার মধ্যে কীটের ডিম পারার ফলে তা থেকেই যে কীটের জন্ম হয়, তা জানতে হলে যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তা তখনকার দিনে ছিল না। ফলে জীবনের উৎপত্তির এই স্বতস্ফুর্ত তত্ত্ব দীর্ঘকাল মানব সমাজে রাজত্ব করেছে। এমনকি শ'চারেক বছর আগেও যখন আধুনিক বিজ্ঞান যাত্রা শুরু করে তখনও এই স্বতঃস্ফুর্ততত্ত্ব (Theory of spontaneous generation) বহাল তবিয়তেই রাজত্ব করছে। শুধু রোগ জীবাণু বা আণুবীক্ষণিক জীবের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি বড় বড় প্রাণীর ক্ষেত্রেও*। ব্রিটিশ গবেষক আলেকজান্দার নীডহ্যাম (১১৫৭-১২১৭) বিশ্বাস করতেন ফার গাছ সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ফেলে রাখলে তা থেকে রাজহাঁস জন্ম নেয়। জ্যান ব্যাপটিস্ট হেলমন্ট (১৫৮০-১৬৪৪) ভাবতেন ঘর্মাক্ত নোংরা অন্তর্বাস ঘরের কোনায় ফেলে রাখলে তা থেকে ইঁদুর আপনা আপনিই জন্ম নেয়! ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় মূলতঃ লুই পাস্তরের গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা এই পুরোন ধারণা ছেড়ে দেই (পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতঃস্ফুর্ততত্ত্ব এবং এর মৃত্যু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে যখন স্বতঃজননবাদ গ্রহনযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল না, তখন অন্য একটি অনুকল্প প্রস্তাবিত হয়। তার মূল কথা হল জীবনের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল মহাবিশ্বে। সেখান থেকে পৃথিবীতে জীবন এসেছে। এ অনুকল্পের নাম বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তি (Extra terrestrial origin of life)। প্রথম দিকে রিখটার, আরহেনিয়াস (তাঁর অনুকল্পের নাম ছিলো 'প্যানস্পার্মিয়া', এ বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে) এবং পরবর্তীতে ব্রুকস, শ', ক্রিক, হয়েল, বিক্রমসিংহ প্রমুখ এই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন। তাদের মতে পৃথিবীর বাইরে কোন গ্রহে বা অন্য কোথাও জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল। সেখান হতে প্রাণ স্পোর বা অনুবীজ হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিল। কিন্তু

* জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বা আপনা আপনি উৎপত্তির ধারণা কিন্তু বহু প্রাচীন। এর প্রমাণ এরিস্টটলের লেখায়ও রয়েছে। যদিও এ কথা তাঁর জানাই ছিল যে জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়, তবুও এরিস্টটল কোন কোন ছোট প্রাণী (যেমন কিছু মাছ এবং পতংগ) স্বতঃস্ফুর্তভাবে উদ্ভুত হয় বলে বিশ্বাস করতেন। তার বিখ্যাত বই প্রাণীজগতের ইতিহাস (Historia Animalium)-এ এধরণের একটি বিবরণ দিয়েছেন :

> 'আধিকাংশ মাছের জন্ম ডিম থেকে হয়ে থাকে। তবে এমন কিছু মাছ আছে যেগুলোর জন্ম হয় কাদা ও বালি থেকে। একবার নিডোসের কাছে একটি পুকুর শুকিয়ে যায়। এর তলদেশের কাদা শুকিয়ে যায়। তারপর বেশ কয়েকদিন পর বৃষ্টিতে পুকুরটি ভরে যায়। এ দেখা গেল পুকুরে জন্মেছে নানা রকমের 'মূলেট জাতীয়' ছোট মাছ। কাজেই এটি পরিস্কার যে কিছু মাছ স্বতঃস্ফুর্তভাবে জন্মায়। তার জন্য ডিমের বা যৌন ক্রিয়ার দরকার হয় না।'

আজকের দিনের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে এরিস্টটলের এ বর্ণনা হয়ত হাসির খোরাক যোগাবে।

মহাশূন্যের পরিবেশ এই আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমনের জন্য এতই প্রতিকুল (নিম্নমাত্রার তাপ, বায়ুর অনুপস্থিতি, উচ্চশক্তির বিকিরণ, অকল্পনীয় দূরত্ব ইত্যাদি) যে এভাবে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ এবং টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। কার্ল স্যাগান আর শকোভস্কি ১৯৬৬ সালে অনুজীবের আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারা হিসেব করে দেখিয়েছেন, অণুজীবগুলো যদি এক মাইক্রনের কম হয় তবে সেগুলোর পক্ষে পৃথিবীতে জীবন ধারণের উপযোগী অঙ্গাণুধারণ করা সম্ভব নয়। আবার অণুজীবগুলো যদি এক মাইক্রনের বেশী হয় তবে পৃথিবীর মত অন্য কোন গ্রহ থেকে এই ধরোনের প্রাণকণা নির্গত হয়ে পৃথিবীতে চলে আসা খুবই কঠিন। আর বিকিরণজনিত বিভিন্ন কারণে সেগুলোর পুড়ে যাবার সম্ভাবনা তো আছেই। তারপরও তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ঠিক ঠিক এক মাইক্রনের অনুজীবেরা কোন না কোন ভাবে পৃথিবীতে আসতে সক্ষম হয়েছিলো, স্যাগান আর শকোভস্কি হিসেব দিয়েছেন যে, পৃথিবীকে একশ' কোটি বছরে একটি মাত্র এ ধরণের স্পোর পেতে হলে আমাদের গ্যালাক্সির ১০০টি প্রাণধারণক্ষম গ্রহকে একসাথে ১০০০ টন অনুবীজ ছড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সিতে এ ধরনের ১০০টি গ্রহ তো দূরের কথা, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন জীবনবাহী গ্রহের সন্ধানই এখনো মেলেনি। আর তাছাড়া যদি ধরেই নেওয়া হয়, বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে প্রাণের বীজ এ পৃথিবীতে এসেছিল, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় বহির্বিশ্বেই বা কি ভাবে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল? তার মানে পৃথিবীর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটির সমাধান করা যাচ্ছিল না, বহির্বিশ্বের দিকে ঠেলে দিয়ে সেই সমস্যাটিকে পেছানোর প্রয়াস নেয়া হল মাত্র।

পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত উল্কাপিন্ড আছরে পড়ছে পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই আমরা এধরনের খবর দেখতে পাই। এগুলোকেই প্রাথমিকভাবে প্রাণ কণার বাহন বলে মনে করেন বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তি তত্ত্বের প্রবক্তারা। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সমস্ত অ্যামাইনো এসিড উল্কাপিন্ডের উপর ভর করে এই পৃথিবীতে এসেছে সেগুলোর সাথে পৃথিবীতে তৈরী অ্যামাইনো এসিডের পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। মহাকাশের উল্কাপিন্ডের সাথে আসা অ্যামাইনো এসিডগুলোর মধ্যে কিছু বামাবর্তী এবং কিছু ডানাবর্তী (left and right-handed); ফলে এগুলোর কোন আলোক ক্রিয়া নেই। কিন্তু পৃথিবীতে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরী অ্যামাইনো এসিডগুলো সবই বামাবর্তী (left-handed)। এ ছাড়া এমন কিছু অ্যামাইনো এসিড উল্কাপিন্ডে পাওয়া গেছে যেগুলো পৃথিবীর কোন জীবে দেখা যায় না। তাই অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন এ সব অ্যামাইনো এসিড থেকে পৃথিবীর অ্যামাইনো এসিড তৈরী হতে পারে না।

আসলে এ পৃথিবীতেই আদিম অবস্থায় অজৈব পদার্থ হতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে এবং তা কোন রহস্যজনক কারণে নয়, বরং জানা কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে - জীবনের এই রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বকেই (Chemical theory of origin of life) আজ পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। গত শতকের শেষভাগে থমাস হাক্সলি আর জন টিন্ডেলের গবেষণায় জীবনের এই বস্তুগত ভিত্তির কথা সাধারণভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তারপরও অনেকটাই ধোঁয়াটে ছিল সবকিছু। ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটেছে, কাটছে। হাক্সলির উত্তরসূরীরা যেমন হার্ডি, উইলসন, বার্নাল, হলডেন, কেলভিন, ওপারিন, মিলার, ইউরে, ডবঝানোস্কি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা মানব মনের কুয়াশা কাটিয়ে জীবনের এই বস্তুবাদীরূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

আমরা আগামী অধ্যায়ে এ তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

পুনর্লিখন : ৮/৮/২০০৬

---

{তৃতীয় অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# অজৈবজনি : জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি

## (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –৪)

অভিজিৎ রায়

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ‘স্বতঃজননবাদের মৃত্যু :

‘স্বতঃজননবাদ’কে (Theory of spontaneous generation) হটিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব অহরহই লুই পাস্তুরকে দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এটিও সত্য যে, স্বতঃজননের মাধ্যমে প্রাণ যে কখনই উৎপত্তি হতে পারবে না - এমন ধারণায় পাস্তুর নিজে কখনই নিঃসন্দেহ ছিলেন না। পাস্তুর এ নিয়ে একবার এমন মন্তব্যও করেছেন, তার বিশ বছরের ক্লান্তিহীন গবেষণায় কখনও মনে হয় নি যে, এভাবে প্রাণের উদ্ভব একেবারেই অসম্ভব। আসলে পাস্তুর তাঁর বিখ্যাত পরীক্ষার সাহায্যে যেটা দেখিয়েছিলেন তা হল, জীবাণুমুক্ত নিয়ন্ত্রিত (পাস্তুর প্রদত্ত) পরিবেশে প্রাণ আপনা আপনি জন্ম নেয় না; কিন্তু অন্য পরিবেশে অন্য ভাবে যে কখনই জন্ম নিতে পারবে না - এই কথা কিন্তু পাস্তুরের ফলাফল হলফ করে বলছে না। ব্যাপারটা একটু পরিস্কার করা প্রয়োজন।



চিত্র ৪.১: লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বতঃজনন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্টই মতভেদ ছিল। ব্যাপারটির একটা সুরাহা করবার জন্য ফরাসী বিজ্ঞানী পুশে (F. A. Pouchet) একটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। তিনি খড়ের নির্যাস নিয়ে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বাতাসে বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ পেলেন যে, অণুজীব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খড়ের নির্যাসে জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু ১৮৬০ সালে লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, ১৮২২-১৮৯৫) পুশের এই ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি ইস্ট এবং চিনির মিশ্রণ একটা পাত্রে ভরে মুক্ত-বাতাসে রেখে দেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখলেন পাত্রের মিশ্রণটি ব্যাকটেরিয়া এবং প্রটোজোয়ায় ভরে গেছে। কিন্তু বাতাসের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে একই পরীক্ষা পুনরায় করে দেখলেন - এবারে কিন্তু কোন অণুজীব জন্মাচ্ছে না।  পাস্তুর ঘোষনা করলেন যে, বাতাসে যদি কোন স্পোর না থাকে, অর্থাৎ বাতাস যদি বিশুদ্ধ থাকে তবে  কোন স্বতঃ জনন হয় না।

পুশে এবং পাস্তুর দুজনই ছিলেন সে সময়কার নামকরা বিজ্ঞানী। কিন্তু একজন স্বতঃজননের সমর্থক, আরেকজন বিরোধী। তাঁদের মতভেদ থেকে আসল সত্যটা বের করবার জন্য ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমী একটি কমিশন গঠন করে দু'বিজ্ঞানীকেই নিজেদের মতবাদের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

দুই বিজ্ঞানীই একমত হলেন যে, উঁচু পর্বতের চূড়ায় বাতাস থাকে তুলনামূলকভাবে বিশুদ্ধ এবং জীবাণুমুক্ত। কাজেই সেখানে গিয়ে ওই জীবাণুমুক্ত পরিবশে পরীক্ষা করলে স্বতঃজননের ব্যাপারে আসল সত্য জানা যাবে।  তাই করলেন পাস্তুর; ২০টি ফ্লাস্কে খড়ের নির্যাস ভরে সেগুলো সীল করে গাধার পিঠে চাপিয়ে রওয়ানা দিলেন আল্পস পর্বতের মাউন্ট ব্ল্যাঙ্কের চূড়ায়। সেখানে গিয়ে তিনি সীলগালা ভেঙ্গে বাতাস ঢুকতে দিয়ে একটু পরেই আবার সীল করে দিলেন। পরে এগুলোকে নিয়ে নিজের গবেষণাগারে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল একটি ছাড়া অন্য কোন ফ্লাস্কে জীবাণু নেই। এ থেকে পাস্তুর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ফ্লাস্কে প্রাণের কোন স্বতঃজনন হয় নি।

১৮৬৪ সালের ২২ শে জুন পুশে এবং পাস্তুর উভয়কেই কমিশনের সামনে হাজির হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হল। পাস্তুর আসলেও পুশে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসলেন না। পাস্তুর তার পরীক্ষায় পাওয়া ১৯ টি ফ্লাস্ক কমিশনের সদস্যদের দেখালেন। কোন জীবাণু দেখা গেল না। তখন কমিশনের থেকে সন্দেহ করা হল যে, ফ্লাস্কের ভিতেরে হয়ত অণুজীব জন্মানোর মত পর্যাপ্ত বাতাস নেই, সে জন্যই জীবাণু জন্মাচ্ছে না। পাস্তুর তখন বাধ্য হয়ে একটি ফ্লাস্কের নল ভেঙ্গে  বাতাস বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে তাতে  বাতাস বা অক্সিজেনের পরিমান স্বাভাবিক মাত্রায়ই আছে। তখন আবার প্রশ্ন তোলা হল, পাস্তুর যে ঈস্টের মিশ্রণ ব্যবহার করছেন তাতে হয়ত অণুজীব বাঁচতে পারে না।  এই সন্দেহের জবাব দিতে গিয়ে পাস্তুর আরেকটি ফ্লাস্কের নল ভেঙ্গে তাতে বাতাস ঢুকালেন, তারপর তিনদিন খোলা জায়গায় রেখে দিয়ে দেখালেন যে মিশ্রণটি অণুজীবে ভর্তি হয়ে গেছে। অন্য ফ্লাস্ক গুলোকে অক্ষত রেখে দেওয়া হল।  বেশ কয়েক বছর পরও তাতে কোন অণুজীব পাওয়া গেল না।  পাস্তুরের সীল করা ফ্লাস্ক ১৪০ বছর পরেও তেমনি অবস্থায় আছে, কোন জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। তার অনেক আগেই অবশ্য প্রমাণিত হয়ে গেছে অণুজীবের স্বতঃজনন হয় না।

## ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব :

স্বতঃ জনন ভুল প্রমাণিত হওয়ায় একটা জিনিস বোঝা গেল যে, আপনা-আপনি প্রাণের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু এটিকে 'বেদ-বাক্য' হিসেবে বিশ্বাস করলে হবে না, কারণ এটি কোন স্বতঃসিদ্ধ নয়। আসলে সঠিক বাক্যটি হবে, 'পৃথিবীর আজকের দিনের যে পরিবেশ সেই পরিবেশে জড় পদার্থ থেকে প্রাণ আপনা-আপনি তৈরী হতে পারে না'। এবারে ঠিক আছে। কারণ, আজকের দিনের পৃথিবীর ছবি প্রাচীন পৃথিবীর ছবিটা থেকে একেবারেই আলাদা। বিজ্ঞানীরা আজ মনে করেন, ওই আদিম পৃথিবীর বিজারকীয় পরিবেশেই জড় উপাদান থেকে ধীরে ধীরে সময় সাপেক্ষ বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে কোন অজ্ঞেয় কারণে নয়, বরং জানা কিছু রায়ায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই তত্ত্বটিকে বলা হয় জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্ব (Chemical theory of Origin of Life)। এই তত্ত্বটির কথা আগের অধ্যায়ে খানিকটা বলেছি। তবে পুরো তত্ত্বটি নিয়ে একটু পরেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

চার্লস ডারউইন এ মতবাদটি মানতেন,* কিন্তু হয়ত গোঁড়া ধর্মবাদীদের ভয়ে মুখ খুলতেন না তেমন। কিন্তু 'ডারউইনের বুলডগ' বলে পরিচিত বিখ্যাত বিজ্ঞানী টিএইচ হাক্সলি আর বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী জন টিন্ডল প্রকাশ্যে সাধারণ জনগণের কাছে জীবনের রাসায়নিক তত্ত্ব প্রচার করে ধীরে ধীরে এটিকে জনপ্রিয় করে তুলেন। তবে জীবনের উৎপত্তির আধুনিক রাসায়নিক তত্ত্বের জন্মদাতা কিন্তু এরা কেউ নন। জন্মদাতা হিসেবে কাউকে গ্রহন করতে হলে করতে হবে রুশ প্রাণরসায়নবিদ ওপারিন (Alexandar I. Oparin) কে। তিনি ১৯২২ সালে 'জীবনের উৎপত্তি' নামে রুশ ভাষায় একটি বই লেখেন। এই বইটিতেই তিনি প্রথম বারের মত এ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছিল তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিবর্তনের দুটি পর্বের কথা তিনি বললেন বইয়ে - রাসায়নিক বিবর্তন (chemical evolution), আর জৈব বিবর্তন (organic evolution)। প্রথম পর্বে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জড় বস্তু থেকে জীবনের উৎপত্তি হয়, পরবর্তী পর্বে ডারউইনের দেখানো পথে জীব থেকে জীবের বিবর্তন ঘটে । ওপারিনের মতে এ দুটি পর্ব আসলে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। দুটি পর্ব মিলেই হয় সম্পূর্ণ বিবর্তন (complete evolution)।

* চার্লস ডারউইনের Origin of Species বা 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে কি ভাবে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিলেও প্রাণের উৎস সম্বন্ধে এটি ছিল নিরব। কিন্তু ডারউইনের ব্যক্তিগত আস্থা ছিল 'আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পরিবেশে অজৈব পদার্থ হতেই যে জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়ে প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশ ঘটেছে' এই রায়ানিক উৎপত্তি তত্ত্বের উপর । জনসমক্ষে এটি প্রকাশ না করলেও 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটি প্রকাশের ক বছর পরে তার বন্ধু জোসফ হুকারকে লেখা একটি চিঠিতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে তার আনুমানের কথা জানিয়ে বলেন, 'একটা ছোট্ট উষ্ম পুকরে (warm little pond) বিভিন্ন ধরণের অ্যামোনিয়া, ফসফরিক লবন, আলো, তাপ, তড়িৎ সব কিছু মিলে মিশে... প্রোটিন যৌগ উৎপন্ন হয়েছে...।' ডারউইন কথিত এই 'ছোট্ট উষ্ম পুকরই' হচ্ছে পরবর্তীতে হালডেন বর্ণিত তথাকথিত 'আদিম স্যুপ' (primordial soup) যা ইউরে এবং মিলার ১৯৫৩ সালে পরীক্ষাগারে সংশ্লেষণ ঘটিয়ে এমিনো এসিড পেয়েছিলেন।

ওপারিনের বইটির বেশ ক'টি রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে **১৯২৭** সালের বর্ধিত সংস্করণটি 'The Origin of Life' নামে ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয় - **১৯৩৮** সালে। কিন্তু এর মধ্যেই হালডেন (J.B.S Haldane) নামে আরেক বিজ্ঞানী ওপারিনের কাজের কথা কিছু না জেনেই প্রায় একই রকম বক্তব্য সহ আরেকটি বই লিখেছিলেন। দুই বিজ্ঞানীকেই সমান স্বীকৃতি দিতে জীবনের উৎপত্তির রাসায়নিক তত্ত্বটিকে এখন **'ওপারিন-হালডেন তত্ত্ব'** নামেই অভিহিত করা হয়।

ওপারিন আর হালডেন দু'জনেই তাদের লেখায় বললেন, সাড়ে চারশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী কিন্তু কোন দিক দিয়েই আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। এ সময় পৃথিবী ছিল প্রচন্ড গরম, অনেকের মতে তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৫০০০-৬০০০ ডিগ্রীর মত। পানি পড়া মাত্রই তা বাষ্প হয়ে উড়ে চলে যেত।



**চিত্র ৪.২:** জেবি এস হালডেন (বামে) আলেক্সান্দার ওপারিন (ডানে)

তখন সেখানে ছিল না কোন প্রাণ, ছিল না কোন মুক্ত অক্সিজেন। আকাশ আর পৃথিবী পরিপূর্ণ ছিল হাইড্রোজেন(H), হিলিয়াম (He), নাইট্রোজেন (N), মিথেন ($CH_4$), অ্যামোনিয়ার ($NH_3$) মত বিষাক্ত গ্যাসে। সাথে ছিল জলীয় বাষ্প আর কিছু খনিজ পদার্থ। পরে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে আর সূর্যের মহাকর্ষের টানে অধিকাংশ প্রাথমিক গ্যাসগুলো উড়ে চলে যায়। অক্সিজেনের পুরোটুকু বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর সাথে মিলে নানা ধরনের অক্সাইড তৈরী করে। কার্বনও বিভিন্ন ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে তৈরী করে নানা ধরনের মেটাল কার্বাইড। তৈরী হয় ধীরে ধীরে কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, সিলিকন-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড আর সামান্য পরিমাণে হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোফ্লোরিক এসিড ইত্যাদি। বায়ুমন্ডলে তো কোন মুক্ত-অক্সিজেন ছিল না, আর সেই সাথে বায়ুমন্ডলের বাইরে আজকের দিনের মত ওজোনের স্তরও ছিল না। তাই সূর্যের আলোর অতি বেগুনী রশ্মি খুব সহজেই পৃথিবীতে এসে পৌঁছুত। আর এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি, কস্মিক রশ্মি গুলোর বিকিরণ, আর সেই সাথে বৈদ্যুতিক বিকিরণও ছিল আজকের দিনের চেয়ে বহুগুন বেশী। ওপারিন আর হালডেনের মতে এমন একটি প্রাণহীন পরিবেশে একটা সময় এসব গ্যাসের উপর উচ্চশক্তির বিকিরণের প্রভাবে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এগুলো পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরো জটিল জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে। এগুলো থেকেই পরবর্তীতে ঝিল্লি তৈরী হয়। ঝিল্লিবদ্ধ এসব জৈব পদার্থ বা প্রোটিনয়েড ক্রমে ক্রমে

এনজাইম ধারণ করতে থাকে আর বিপাক ক্রিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এটি একসময় এর মধ্যকার বংশগতির সংকেত দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি তৈরী করতে ও বা পরিব্যক্তি (mutation) ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবেই একটা সময় তৈরী হয় প্রথম আদি ও সরল জীবনের। তবে এ স্তরে জীবন ছিল অকোষীয়; পরে তা থেকে কোষীয় জীবের উদ্ভব হয়। এ তত্ত্বটির মূল নির্যাসটি হল এটি অজৈবজনি (abiogenesis) - অর্থাৎ, অজৈব জড় থেকে জীবের উৎপত্তির নিদর্শক। একই ধরনের অজৈবজনি সংক্রান্ত ধারণা সমন্বিত করে পরবর্তীতে বই লেখেন জে ডি বার্নাল 'The physical basis of life' (১৯৫১) এবং দু'বার নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী হ্যারল্ড ইউরে 'Planets, their origin and Development' (১৯৫২) শিরোনামে। তাঁদের এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ক্রমিক অবদানের পরিপ্রেক্ষিতেই জীবনের অজৈবজনি বা রাসায়নিক উৎপত্তির তত্ত্বটি ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়।

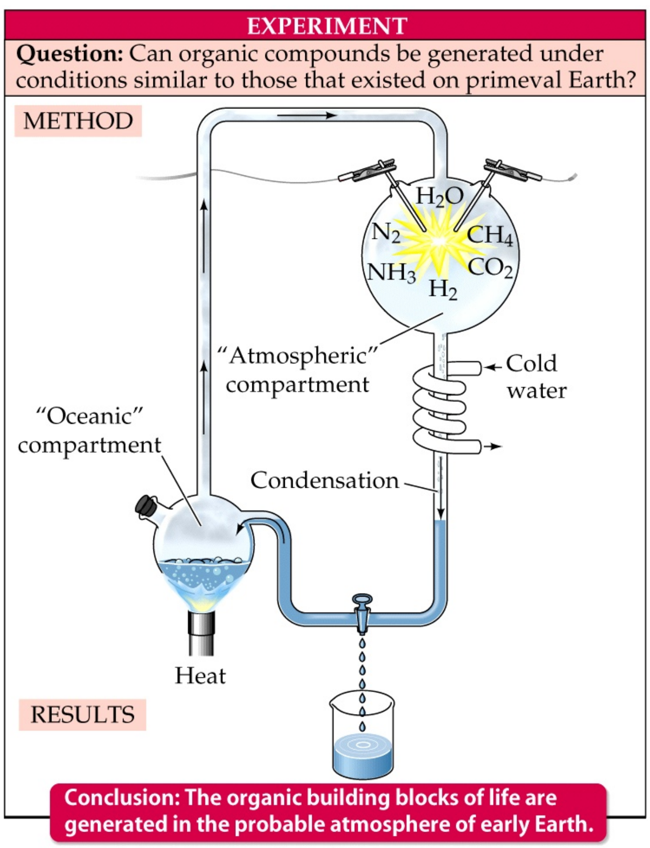
## ওপারিন-হালডেন তত্ত্বের সত্যতা যাচাই:

তত্ত্ব দিলেই তো হবে না, এর পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ চাই। কি ভাবে বোঝা যাবে যে ওপারিন-হালডেন সত্যি কথা বলছেন? ওপারিন-হালডেনের তত্ত্বানুযায়ী,আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অনেক সরল অজৈব পদার্থ থেকে আপনা-আপনি নানা ধরনের জটিল জৈব পদার্থ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা খুবই কঠিন। কারণ পৃথিবী তো আর আদিম পরিবেশে চুপটি করে বসে নেই। এর পরিবেশ ইতিমধ্যেই বদলে গেছে বিস্তর। এ পরিবর্তিত পরিবেশে তো পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার কোন মানে হয় না। তাহলে দরকার একটা কৃত্রিম পরিবেশের। কোনভাবে যদি এই কৃত্রিম আদিম পরিবেশ তৈরী করে দেখানো যায় যে, পৃথিবীর আদিতে যে সমস্ত গ্যাস প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল এবং তখন যে সমস্ত শক্তি আর বিকিরণ সক্রিয় ছিল, তাদের প্রভাবে অ্যামাইনো এসিড, বিভিন্ন সরল শর্করা, জৈব এসিড আর তার বেসসমূহ তৈরী হতে পারে, তাহলেই জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত অনুকল্পটির পক্ষে জোরালো যুক্তি পাওয়া যাবে।

শিকাগো বিশ্ববিদালয়ের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রসায়নবিদ হ্যারলড সি. ইউরে (Harld C. Urey) তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্র স্টেনলি এল. মিলার (Sanley L. Miller) কে ওপারিনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবন উদ্ভবের অনুকল্পটি সঠিক কিনা যাচাই করে দেখতে বললেন। মিলার ১৯৫৩ সালে একটি বায়ু নিরোধক কাঁচের ফ্লাস্কে আদি পৃথিবীর পরিবেশের একটা নকল দশা তৈরী করেন, অনেকটা প্রদত্ত ছবির মত (চিত্র ৪.৩ ক)। তিনি আগেই পাম্প করে এর ভিতর থেকে বাতাস বের করে নেন। তারপর সংযুক্ত ফ্লাস্কের পানি ফুটিয়ে জলীয় বাষ্প তৈরী করেন। একটি বড় পাঁচ লিটার ফ্লাস্কে হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবেশ

করান। সেখানে ওই আগের ফুটন্ত জলীয় বাষ্প এসে মিশে যায়। এবার তিনি মিশ্রণে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালু করেন। বিক্রিয়াজাত গ্যাসগুলোকে শীতকের সাহায্যে ঘনীভূত করা হয়, এবং তারপর সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়।

লক্ষ্যনীয় যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে প্রথম পরীক্ষাতেই ৯ টি অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে (১) গ্লাইসিন, (২)এলানি, (৩) আলফা-অ্যামাইনোবুট্যায়িক এসিড, (৪) আলফা- অ্যামাইনোসোবুট্যায়িক এসিড, (৫) বিটা-এলানি, (৬) এস্পারটিক এসিড, (৭) গ্লুটামিক এসিড, (৮) সারকোসিন, এবং (৯) এন-মিথাইল এলানিন। এছাড়াও তৈরী হয় এলডিহাইড ও কিটোন। এই দুটি উপাদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো জাড়িত হয়ে পরে জৈব এসিড তৈরী করতে পারে।

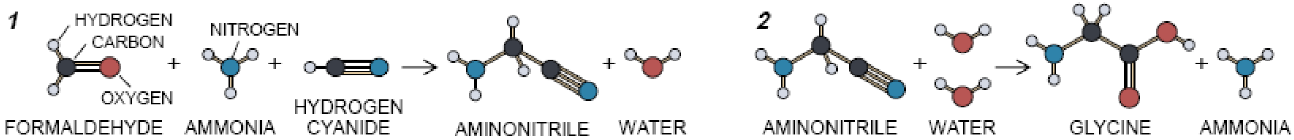





| AMINO ACID | MURCHISON METEORITE | DISCHARGE EXPERIMENT |
|---|---|---|
| GLYCINE | • • • • | • • • • |
| ALANINE | • • • • | • • • • |
| α-AMINO-*N*-BUTYRIC ACID | • • • | • • • • |
| α-AMINOISOBUTYRIC ACID | • • • • | • • |
| VALINE | • • • | • • |
| NORVALINE | • • • | • • • |
| ISOVALINE | • • | • • |
| PROLINE | • • • | • |
| PIPECOLIC ACID | • | • |
| ASPARTIC ACID | • • • | • • • |
| GLUTAMIC ACID | • • • | • • |
| β-ALANINE | • • | • • |
| β-AMINO-*N*-BUTYRIC ACID | • | • |
| β-AMINOISOBUTYRIC ACID | • | • |
| γ-AMINOBUTYRIC ACID | • | • • |
| SARCOSINE | • • | • • • |
| *N*-ETHYLGLYCINE | • • | • • • |
| *N*-METHYLALANINE | • • | • • |

**চিত্র ৪.৩:** (ক) মিলার ও ইউরের বিখ্যাত পরীক্ষা : আদিম বিজারকীয় পরিবেশে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে জৈব বস্তু উৎপাদন (খ) মিলার ও ওর্গেল প্রমুখের পরীক্ষায় উৎপন্ন ১৮ টি জৈব এসিড

উৎপন্ন এমিনো এসিড গুলোর মধ্যে প্রাচুর্য আর গুরুত্বের দিক দিয়ে গ্লাইসিন নিঃসন্দেহে থাকবে এক নম্বরে। গ্লাইসিন তৈরী হয় ফরমালডিহাইড, অ্যামোনিয়া আর হাইড্রোজেন সায়ানাইডের সমন্বয়ে। মিলারের পরীক্ষায় গ্লাইসিন কিভাবে তৈরী হয় তা নীচের ছবিতে (চিত্র ৪.৪) দেখানো হয়েছে।




**চিত্র ৪.৪:** মিলারের পরীক্ষায় কিভাবে গ্লাইসিন উৎপন্ন হয় তা দেখানো হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মিলার ও ইউরে (১৯৫৫), মিলার ও ওর্গেল (১৯৭৪), মিলার (১৯৮৭) একই পদ্ধতিতে ২০টির মধ্যে ১৮ টি জৈব এসিড এভাবে তৈরী করেছিলেন। তাদের পরীক্ষাই সর্বপ্রথম প্রমাণ করে ওপারিনের অনুকল্প সঠিক; অর্থাৎ, আদিম বিজারকিয় পরিবেশে সত্যই অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উন্মেষ ঘটেছিল। এ আবিষ্কারের জন্য ইউরে (দ্বিতীয়বার) এবং মিলার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।



**চিত্র ৪.৫** গবেষণাগারে গবেষণারত স্ট্যানলি এল. মিলার (১৯৫৩ সালে তোলা ছবি)

মিলার-ইউরের কাজের কথা প্রচারিত হবার পর পরই সারা দুনিয়া জুড়ে এ ধরনের কাজের হিড়িক পড়ে যায় একেবারে। অনেকেই নানা রকম দ্রব্য মিশিয়ে বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব বস্তু থেকে জৈব বস্তু পাওয়া যায় কিনা দেখতে শুরু করেন। এর মধ্যে পাবলোবস্কায়া ও পেসিসিস্কি (১৯৫৯), ফিলিপ এবেলসন (১৯৫৭), অরো (১৯৬৩), গ্রাসেনবেখার ও নাইট (১৯৬৫), ডোজ ও রাজেউস্কি (১৯৫৭), হারাডা ও ফক্স (১৯৬৯), গ্রথ ও ওয়েনসেফ (১৯৫৯) প্রমুখের পরীক্ষাগুলো উল্লেখযোগ্য। সবাই কিন্তু মিলার-ইউরের মতই ফলাফল পেয়েছিলেন। আর এখন তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্রাজুয়েট রসায়ন কোর্সেই ছাত্ররা সাফল্যের সাথে মিলার-ইউরের বিখ্যাত পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করতে পারে।

শুধু ল্যাবরেটরীর পরীক্ষাগুলোই যে ওপারিন হাইডেল তত্ত্বের একমাত্র প্রমাণ তা কিন্তু নয়। জ্যোতির্বিদ্যা আর ভুতত্ত্ববিদ্যার বহু সাক্ষ্যই এখন এই তত্ত্বের অনুকূলে। মহাকাশের অনেক তারা, ধুলি মেঘ, মহাশূন্য ও আবহাওয়ামন্ডলে অজৈব পদার্থের অণু থেকে জৈব মনোমার (Organic monomers) গঠনের বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপীয় মহাকাশ এজেন্সির গিয়োটো মহাশূন্যযান (Giotto spacecraft) ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুর অভ্যন্তরে চিনি, অ্যালডিহাইড, অ্যালকোহল, এবং এসিডের সমন্বয়ে গঠিত ফরমালডিহাইডের পলিমারের সন্ধান পায়। আবার আকাশ থেকে পড়া অনেক উল্কাপিন্ডেই সময় সময় নানা ধরনের জটিল জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া যায়। চাঁদ থেকে নিয়ে আসা শিলাখন্ডেও খুব সামান্য পরিমানে হলেও ছয়টি পরিচিত সাধারণ এমিনো এসিডের খোঁজ পাওয়া গেছে। এমনকি এই পৃথিবী পৃষ্ঠেই দেখা গেছে নির্বাত প্রক্রিয়ায় (abiotically) আগ্নেয়গিরির গ্যাসের মধ্যকার ধাতব কার্বাইড আর উত্তপ্ত গলিত লাভা পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোকার্বন তৈরী করছে।

উপরের উদাহরণগুলোর সবগুলোই আদিম পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকে জৈবপদার্থের উদ্ভবের সম্ভাবনাটিকে অত্যন্ত শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রসায়ান চর্চার প্রথম দিকে মানুষের ধারণা ছিল জৈব পদার্থ এবং অজৈব পদার্থ এক্কেবারেই আলাদা দু'টি জিনিস - এদের বৈশিষ্ট্য একদম আলাদা। তারা ভাবতেন জৈব পদার্থ এক অর্থে অনন্য; কারণ জৈব পদার্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনদায়ী শক্তি (life force)[†] যা কোন অজৈব পদার্থে নেই। জীবদেহ গঠিত হয় জৈব পদার্থ দিয়ে, তাই এতে রয়েছে প্রাণশক্তির স্ফুরণ; আর অন্যদিকে জড় জগৎ তৈরী হয়েছে অজৈব পদার্থ ফিয়ে - তাই তারা প্রাণহীন ও নিথর। জৈব পদার্থের আনন্যতার ধারণাটি মানুষের মনে এতটাই স্থায়ী আসন গেড়ে গিয়েছিল, এর ভুত এখনও আমাদের কাঁধ থেকে নামে নি। এখনও আমাদের পাঠ্য বইগুলোতে 'জৈব রসায়ন' আর 'অজৈব রসায়ন' - আলাদা দু' ভাগে ভাগ করে ছাত্রদের রসায়ন পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই সজ্ঞাত ধারণাটি হঠাৎ ধাক্কা খেল ১৮২০ সালে এসে যখন বিজ্ঞানী ভোয়েলার (Wöhler) তাপ প্রয়োগে অজৈব এমোনিয়াম সায়ানেট থেকে ইউরিয়া নামক জৈব পদার্থ উৎপন্ন করলেন:

$$NH_4.CNO \rightarrow CO(NH_2)_2$$

(এমোনিয়াম সায়ানেট) (ইউরিয়া)

[†] ভ্রমাত্মক life force বা জীবনদায়ীশক্তি নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া আবিস্কার করে ভোয়েলার তার শিক্ষক বার্জিলিয়াসকে চিঠি লিখে জানান : 'প্রাণীর বৃক্ক ছাড়াই আমি ইউরিয়া তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি।' এরপর আরেক বিজ্ঞানী কোলবি (Kolbe) অজৈব মৌল থেকে অ্যাসিটিক এসিড তৈরী করতে সক্ষম হন। এই সমস্ত আবিস্কারের ফলে জৈব- আজৈবের মাত্রাগত পার্থক্যটুকু ঘুঁচে গেল। যারা জৈবপদার্থকে প্রথম থেকেই 'অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ' একটা কিছু বলে ভেবে নিয়েছিলেন, মনে করেছিলেন জীবনশক্তির (life force) সাহায্য ছাড়া কখনো জৈব পদার্থ তৈরী করা সম্ভব নয়, তাদের বিশ্বাস কিন্তু টলে গেল। এখন তো বিজ্ঞানীরা রসায়নগারে শত শত জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন যে, আমাদের দেহের কার্বন অণুর সাথে ওই মালবাহী ট্রাকটির সায়লেন্সার পাইপের মধ্যে দিয়ে বেরুনো ময়লা কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের ভিতর লুকিয়ে থাকা কার্বন অণুর আসলে কোনই পার্থক্য নেই। কোন জাদুকরের কেরামতিতে অজৈব পদার্থের প্রাণহীন কদাকার কার্বন অণুগুলো জৈব পদার্থে গিয়ে 'সজীব' হয়ে উঠছে না; কোন 'অলৌকিক' জীবনদায়ী শক্তি উষর, বন্ধ্যা কার্বন অণুগুলোকে বদলে দিয়ে (জৈব পদার্থের ভিতর) এগুলোকে প্রাণে প্রাণে পুষ্পিত করে তুলে না। শুধু কার্বন নয়- সেই সাথে হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং নাইট্রোজেন (N), যেগুলোকে একসাথে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে CHON নামে চিনেছি সেগুলোও কিন্তু অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থে আসার জন্য কোন বিশেষ 'ওহী প্রাপ্ত' হয় না। এদের চেহারা আর বৈশিষ্ট্য কিন্তু একই রকমই থেকে যায়। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জৈব যৌগের উদ্ভব কোন রহস্যময় কারণে নয়, বরং তারা মনে করেন, সুদূর অতীতে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিলো, যা ১৯৫৩ সালে ইউরে-মিলারের পরীক্ষায় অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, সে সব আদিম জৈব উপাদান থেকেই কালের পরিক্রমায় গড়ে উঠেছিল প্রথম জীব। আগামী অধ্যায়ে জীবনের উৎপত্তির পেছনে রাসায়নিক বিবর্তনের ধাপগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে ।

পুনর্লিখন : ১৯ আগাস্ট, ২০০৬

{চতুর্থ অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# প্রানের উৎপত্তির ধাপগুলো

## (প্রানের প্রান জাগিছে তোমারি প্রানে –৫)

### অভিজিৎ রায়

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলো-এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
–জীবনানন্দ দাশ

বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে ল্যাবরেটেরীতে কি কখনও প্রাণ তৈরি করতে পারবে? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া আজকের দিনের বিজ্ঞানীদের জন্য একটি মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতেই ওপারিন ও হালডেন প্রস্তাবিত জীবনের রাসায়নিক বিবর্তনের অনুকল্পটির সত্যতা যাচাই করা বেশ জরুরী একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল একটা সময়। ইউরে-মিলারের ঐতিহাসিক পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে জীবনকে বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝবার ক্ষেত্রে একটি বড় অর্জন। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকেই আমরা জেনেছি কৃত্রিমভাবে কোন জীবন বা জীবকোষ তৈরী করা এখনও সম্ভব না হলেও অনেক সরল অজৈব অণু ($H_2$, $NH_3$, $CH_4$, $H_20$, HCN প্রভৃতি) থেকে কোষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক উপাদানসমূহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, ল্যাবরেটরীতেই। পাঠকদের মনে থাকবার কথা যে, মিলারের পরীক্ষায় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল বিদ্যুৎ প্রবাহ, অতিবেগুনী আলো, উচ্চ শক্তির বিকিরণ আর তাপ (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এগুলো সবই কিন্তু আদিম পৃথিবীতে ছিল। কাজেই আদিম বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকেই জৈবপদার্থ উন্মেষের ধারণাটিকেই প্রাণ সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপের ক্ষেত্রে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে বিজ্ঞানীরা গ্রহন করে নিয়েছেন, যদিও মহাকাশ থেকে অন্য কোন উপায়ে পৃথিবীতে প্রাণের আগমন ঘটার সম্ভাবনাকে (যেটিকে প্যানস্পারমিয়া নামে অভিহিত করা হয়) তারা বাতিল করে দেন নি*। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মিলারের ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসের একটি সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ পাঠকদের জন্য তুলে ধরা মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাক্ষাৎকারে ডঃ মিলার বলছেন (Henahan, 1996) :

> ‘আমরা সত্যই জানিনা আমাদের পৃথিবী তিনশ বা চারশ কোটি বছর আগে ঠিক কেমন ছিল। কাজেই সেখানে নানা ধরনের অনুমান আর কল্পনার অবকাশ থাকতে পারে। বড়

---

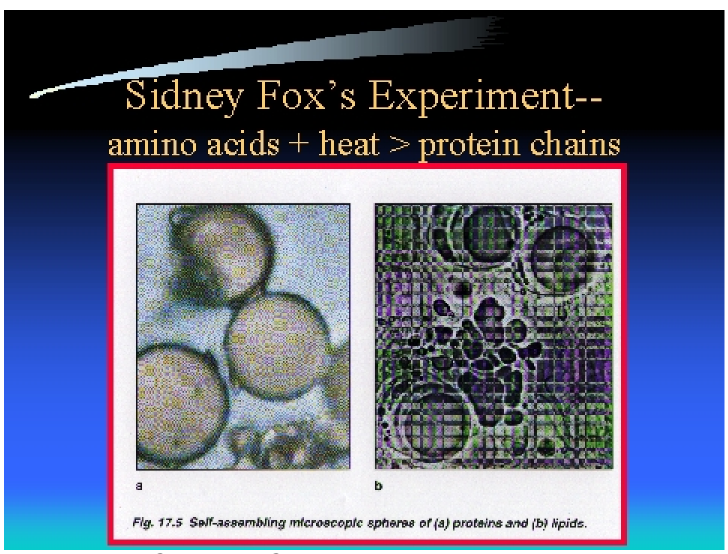
* সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীরা সন্দেহ পোষণ করছেন যে আদিম পৃথিবীর পরিবেশ মিলার-ইউরে যেমনি ভেবেছিলেন ঠিক তেমন বিজারকীয় বোধ হয় ছিল না (Kerr, 1980)। আদিম পরিবেশ ছিল সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ - এটি না বিজারকীয়, না জারীয়। ফলে প্যানস্পারমিয়া (Panspermia) তত্ত্বটি ইদানিং কালে বিজ্ঞানীদের কোন কোন মহলে নতুন করে জনপ্রিয় হয়েছে (Paul Davis, 2003)। আমরা প্যানস্পারমিয়া নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

> অনিশ্চয়তা হচ্ছে সে সময়কার পৃথিবীর পরিবেশ নিয়ে। মূল বিবাদটা এখানেই। পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে হ্যারল্ড ইউরে অভিমত দিলেন যে, আদি পৃথিবীর পরিবেশ সম্ভবত বিজারকীয় ছিল। কারণ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুনসহ সৌরজগতের অন্যান্য সকল গ্রহের পরিবেশই এরকম। যদিও ওই আদি পরিবেশের গাঠনিক উপাদান নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু আমরা দেখিয়েছি যে হয় আপনাদের হাতে আদিতে বিজারকীয় পরিবেশ থাকতে হবে, নতুবা আপনি জীবন গঠনের জন্য কোন জৈব যৌগ পাবেন না। যদি আপনি ওগুলো পৃথিবীতে তৈরী না করেন, আপনাকে তাহলে ধুমকেতু, উল্কা কিংবা ধূলিকণার উপর নির্ভর করতে হবে। কিছু পদার্থ যে ওগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছিল তা সত্যি। কিন্তু আমার মতে এ ধরনের উৎস হতে পাওয়া পরিমাণ এতোই কম যে তা জীবনের উৎপত্তি ঘটানোর জন্য যথেস্ট নয়।’

ইউরে-মিলারের পরীক্ষাটি নিঃসন্দেহে একটি বড় মাইল ফলক, জীবনকে বুঝবার জন্য, জীবনের বস্তুবাদী ধারণাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কিন্তু এ পরীক্ষার ফলাফলই শেষ কথা নয়। কারণ, জৈব অণুগুলো জীবন গঠনের প্রথমিক উপাদান হতে পারে, কিন্তু কোন ভাবেই ‘জীবন’ নয়। জীবনকে বুঝবার জন্য, মানে জীবনের প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি করবার জন্য বিজ্ঞানীরা তাই ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, যেগুলোকে ইংরেজীতে বলে ‘সিমুলেশন এক্সপেরিমেন্ট’। এই সিমুলেশন এক্সপেরিমেন্টগুলো আমাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষনীয় সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে; যেমন, জাগিয়ে তুলেছে নিউক্লিয় এসিডের উপাদান কিংবা এডেনোসাইন ট্রাইফসফেট (এটিপি) তৈরি হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাকে - যেগুলো আসলে কাজ করে জীবজগতে শক্তির আধার হিসেবে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, জীবন বা জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর আসলে প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের সিমুলেটেড পরীক্ষারই ফলাফল। তারা মনে করেন, যে বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে অজৈব পদার্থ থেকে জীবনের সরল অণু গঠিত হয়েছিল, সেগুলো সম্পন্ন হয়েছিল আসলে সমুদ্রের গভীর তলদেশে, বিজ্ঞানী হালডেন যাকে বলেন, ‘উত্তপ্ত লঘু স্যুপ’ (Hot dilute soup)। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আরেকটি সম্ভাবনার কথাও বেশ জোরেসোরে বলছেন। সেটি হল, জৈব অণুগুলো সমুদ্রের স্যুপে গঠিত হয়নি, বরং তৈরী হয়েছিল পানিতে ডুবে থাকা এক ধরনের পাথুরে খনিজে; আর নয়ত জটিল, আধান যুক্ত কাদামাটির পিঠে। কাদা মাটির কথা বলা হল বটে, তবে এটি মনে রাখতে হবে, আজকের দিনে মাটি বলতে আমরা যা বুঝি, সেসময়কার মাটি ছিল এ থেকে ভিন্ন। জৈব ধবংসাবশেষ মিশ্রত জটিল সিলিকেট, যা এখনকার মাটির উপাদান, তা তখনও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। আসলে চুর্ণ সিলিকেট, কোয়ার্জ, বা অন্যান্য আকরিকের ভগ্নস্তুপের জলীয় আবরণে আদি বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। অনুমান করা হয়, শুধু অ্যামাইনো এসিড তৈরীতেই নয়, অ্যামাইনো এসিডগুলো পরষ্পর বিক্রিয়া করে (ডিহাইড্রেশন) যে পলিপেপটাইড বা প্রোটো-প্রোটিন গড়েছিল, তার পেছনে প্রাচীন কাদা-মাটি আর খনিজ পদার্থগুলো একটা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। অন্যান্য বৃহৎ বায়োপলিমারগুলোও

প্রায় একইরকম অনুঘটক দিয়ে প্রভাবিত হয়ে উৎপন্ন হয়েছিল। ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকের দিনেও আমরা দেখি রাসায়নিক শিল্পকারখানাগুলোতে জৈব পদার্থ তৈরীর জন্য অহরহই নানা ধরনের খনিজ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইউরে-মিলারের পরীক্ষায় বিজারকীয় পরিবেশে অজৈব পদার্থ থেকে জৈব অণু সফলভাবে উৎপন্ন করার পর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা শুরু হয় জীবনের পরবর্তী ধারাবাহিকতাগুলো জানবার, বুঝবার। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার মায়ামি ইউনিভার্সিটির সিডনি ফক্সের গবেষণার কথা একটু পাঠকদের বলা যাক, কারণ তার গবেষণা থেকেই আদি জীবকোষ তৈরীর একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। মিলারের পরীক্ষায় পাওয়া অ্যামাইনো এসিড, অ্যাসপারটিক আর গ্লুটামিক এসিডগুলোকে নিয়ে অধ্যাপক ফক্স উত্তপ্ত করলেন - ১৩০ থেকে ১৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায়; ফলে প্রোটিনের মত একটি দ্রব্য উৎপন্ন হল। এর নাম দেওয়া হল *তাপীয় প্রোটিনয়েড*। এটি অনেক দিক দিয়েই প্রকৃতিতে পাওয়া প্রোটিনের মত। অধ্যাপক ফক্স, এই সব প্রোটিনয়েডকে পানিতে সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে পেলেন অনেকটা আদি কোষের মত দেখতে ঝিল্লিবদ্ধ *প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার*। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে এগুলোকে একেবারে আদি কোষের মত দেখায়; শুধু তাই নয় - ল্যাবরেটরীতে উৎপন্ন এই মাইক্রোস্ফিয়ার গুলোকে কৃত্রিম ভাবে জীবাশ্মে পরিণত করেও দেখা গেছে প্রায় তিনশ কোটি বছর আগেকার প্রাথমিক জীবাশ্ম গুলোর সাথে এর অবিকল মিল!




**চিত্র ৫.১ :** সিডনী ফক্সের পরীক্ষণ থেকে পাওয়া প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো কি জীবিত? মানে এদের কি সত্যই কোন প্রাণ আছে? প্রশ্নটি অধ্যাপক ফক্সকে করেছিলেন টিম বেরা (Berra, 1990)। এমনতর বেয়ারা প্রশ্ন

করবার কারণও আছে। এই প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো প্রোটিনের দুটি স্তরে বিন্যস্ত, এরা বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয়, এর বহির্ভাগটি দেখতে অনেকটা কোষের ঝিল্লির মতই। এদেরকে যদি দ্রবণের মধ্যে বাধাহীন ভাবে বিচরণের সুযোগ দেওয়া হয়, এরা একই রকমের প্রোটিনয়েড শোষণ করে 'বৃদ্ধি প্রাপ্ত' হয়। এরা ঈষ্ট বা ব্যাকটেরিয়ার মতই নড়াচড়া করে, অঙ্কুরিত হয়। কোষ বিভাজনের মত একধরণের বিভাজনও ঘটে এদের। এটিপি সরবরাহ করা হলে এদের বিচলন ক্ষমতাও বেড়ে যায়। মাইক্রোস্ফিয়ারগুলো আস্রবণীয় (Osmotic) আর নির্বাচিত বিশোষণমূলক (selective difussion) ধর্ম প্রদর্শন করে, যা কিনা জীবিত কোষের মধ্যেই কেবল দেখা যায়। তার পরেও এই মাইক্রোস্ফিয়ার গুলো জীবিত কিনা, টিম বেরার এই প্রশ্নের উত্তরে ফক্স বলেছিলেন, এগুলো 'প্রোটো-এলিভ'; মানে, 'জীবন সদৃশ'।

অধ্যাপক ফক্স কিন্তু চাতুরী করে বেরার প্রশ্ন এড়িয়ে যান নি; তিনি এমনতর উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ বিজ্ঞানের চোখে প্রাণ আর অ-প্রাণের সীমারেখাটা খুব স্পষ্ট আর পরিস্কার নয়। যেহেতু অজৈব জড় পদার্থ থেকেই প্রাণ বা জীবনের বিকাশ ঘটেছে, সুতরাং জড় জগৎ আর জীব জগতের মাঝামাঝি জায়গায় আমরা সাদামাঠাভাবে একটা সীমারেখা সবসময়ই আঁকতে পারি যেটা অতিক্রম করলে সমস্ত কিছুই জীবিত, আর ওই সীমা না পেরুলে সমস্ত কিছুই প্রাণহীন। আমরা সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে ভাইরাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, ভাইরাস এমনিতে 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত পোষকদেহ না জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। কাজেই ভাইরাস বাস করে ওই প্রাণ অ-প্রাণের সীমারেখা বা বর্ডার লাইনের ঠিক মাঝখানে। তবে ভাইরাসই যে প্রাণের সবচেয়ে সরলীকৃত রূপ, তা কিন্তু নয়। ভাইরাসের চেয়েও সরল প্রাণের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন *ভিরইডস* (Viroids) এর মধ্যে। এগুলো মূলতঃ পেঁচানো সরল জেনেটিক পদার্থ দিয়ে তৈরী, যেগুলোকে টেনে লম্বা করলে বেড়ে ৩ ফুটের মত দাঁড়ায়। এই ভিরইডস জীবাণুর কারণে গাছপালায় 'avocado sun blotch', 'coconut cadang cadang' কিংবা 'tomato bunchy top' জাতীয় বিদ্ঘুটে নামের নানা ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়। ভাইরাসের মত ভিরইডসদেরও জীবিত হওয়ার জন্য 'পোষক দেহ' দরকার হয়, নইলে এরাও জড় পদার্থের মতই আচরণ করে। ভিরইডসই শেষ নয়, এর চেয়েও ক্ষুদ্র পরিসরে বিজ্ঞানীরা জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। যেমন ওই *প্রিয়নের* (prions) কথাই ধরা যাক। এগুলোর আকার এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচাইতে ছোট ভাইরাসের একশ ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে এক হাজার ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। আর এগুলো এতই সরল যে এর মধ্যে জেনেটিক উপাদানও নাই, এগুলো স্রেফ প্রোটিন দিয়ে তৈরী। ভাইরাস আর ভিরইডসের মত এরাও জীবকোষে ঢুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দখল নিয়ে নেয়। গবাদি পশু বিশেষত ভেরার মধ্যে *স্ক্রাপি* (scrapie) নামে একধরনের রোগের জন্য এই প্রিয়নগুলোকে দায়ী করা হয়। এই যে কিছুদিন আগে *ম্যাড কাউ* রোগ নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে এত তোলপার হল, এর পেছনেও কিন্তু দায়ী ওই প্রিয়নেরা। শুধু পশু পাখি নয়, মানবদেহে 'multiple sclerosis', 'Creutzfeld-Jacob',

'Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome', আর 'Lou Gehrig's' রোগের জন্যও এই প্রিয়নেরাই সম্ভবত দায়ী। প্রিয়নেরা বিজ্ঞানীদের জন্য সবসময়ই একটি বিস্ময়। কারণ, জেনেটিক পদার্থ (জিনোম আর নিউক্লিয়িক এসিড) বিহীন এই অদ্ভুতুরে হতচ্ছারা জিনিসটা শুধু প্রোটিন দিয়ে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও কোষের অভ্যন্তরে উপযুক্ত পরিবেশে প্রাণের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে, রোগ ছড়াতে পারে। প্রিয়নের অস্তিত্ব জীববিজ্ঞানের এতদিনকার গড়ে ওঠা 'বিশ্বাসে' আঘাত করেছে - যেটি বলত, প্রতিটি জীবন্ত অবয়বের অনুলিপির জন্য নিউক্লিয়িক এসিড অত্যাবশ্যক। এখন জীব-জড়ের পার্থক্যসূচক বর্ডার লাইটি টনতে গিয়ে কিন্তু বিপদেই পড়ব আমরা। এটা কি ভাইরাসের উপর দিয়ে টানা হবে, নাকি প্রিয়নের উপর দিয়ে টানা হবে - এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। আবার, প্রিয়ন, ভিরইডস আর ভাইরাসকে 'প্রাণ' হিসেবে, কিংবা প্রাণের সরলতম প্রকাশ হিসেবে আভিহিত করতে অনেকেই আপত্তি তুলবেন। কারণ, এটা তো সত্যই যে, এদের প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটে তখনই যখন তারা উপযুক্ত জীবদেহ খুঁজে পায়। সে হিসেবে কিন্তু মাইক্রোস্ফিয়ার, যেগুলোর কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি সেগুলোই হয়ত প্রথম জীবন বা জীবের পূর্বসুরী ছিল- একথা স্বীকার করে নিতেই হবে। কারণ মাইক্রোস্ফিয়ারের সাথে প্রোটোসেল বা আদিকোষের মিল অনেক। অধ্যাপক ফক্স যে ল্যাবরেটরীতে মাইক্রোস্ফিয়ারের সন্ধান পেয়েছিলেন, সেই *প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার* গুলোই আসলে আদি কোষের উৎপত্তিতে অন্তরবর্তী ধাপ ছিল। এ প্রসঙ্গে সিডনী ফক্স বলেন (Fox, 1988) :

> 'প্রোটিনয়েড হচ্ছে জটিল প্রোটিন সদৃশ পদার্থ, এবং মাইক্রোস্ফিয়ার অনেকটা কোষ সদৃশ একক, যা তৈরী হয় প্রোটিনয়েড এবং পানি পরস্পরের সংস্পর্শে আসার ফলশ্রুতিতে। এগুলো একেবারে আদি ধরণের কোষের ভুমিকা পালন করে, যাদের মধ্যে জীবনের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। জীবনের একক হচ্ছে কোষ, আর আদি জীবনের একক হচ্ছে আদিকোষ বা প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার নামের প্রোটোসেলগুলো।'

## জীবনের রাসায়নিক বিবর্তনের ধাপসমূহ :

মোটামুটিভাবে যে ধাপগুলো অনুসরণ করে এই পৃথিবীতে প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটেছে, তা নিয়ে এবার একটু ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যাক। আমরা তো গত কয়েকটি পর্ব ধরে অনবরত বলেই যাচ্ছি যে, আমাদের এই মলয় শীতলা নান্দনিক পৃথিবীটা একটা সময় এত উত্তপ্ত ছিল যে, সেই আবহাওয়াতে হাইড্রোজেন, মিথেন, এমোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন জৈব পদার্থ ছিল না। ছিল না সেখানে মুক্ত অক্সিজেন। কাজেই সেই বিজারকীয় পরিবেশে প্রাপ্ত অজৈব পদার্থগুলো থেকে জৈব পদার্থের উৎপত্তিই হচ্ছে

জীবনের প্রাথমিক ধাপ। ধাপগুলোকে ধারাবাহিকভাবে লিখলে দাড়াবে অনেকটা এরকম :

***ধাপ-১:*** **জৈব যৌগের উৎপত্তি :**

- হাইড্রোকার্বন উৎপাদন (মুক্ত পরমাণুগুচ্ছ CH এবং $CH_2$ এর বিক্রিয়া, বাষ্পের সাথে মেটালিক কার্বাইডের বিক্রিয়া)
- হাইড্রোকার্বনের অক্সি ও হাইড্রক্সি-উপজাতের উৎপাদন (বাষ্প ও হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় এলডিহাইড, কিটোন উৎপাদন)
- কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন (গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ আর ঘনীভবনের ফলে চিনি, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন)
- ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের উৎপত্তি (ফ্যাট বা চর্বির ঘনীভবন)
- অ্যামাইনো এসিড গঠন (হাইড্রোকার্বন, অ্যামোনিয়া আর পানির বিক্রিয়া)

***ধাপ-২:*** **জটিল জৈব অণুর উৎপত্তি** (পলিমার গঠন)

- প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার
- কো-এসারভেট

***ধাপ-৩:*** **পলিনিউক্লিয়োটাইড বা নিউক্লিক এসিড গঠন**

***ধাপ-৪:*** **নিউক্লিয়োপ্রোটিন গঠন**

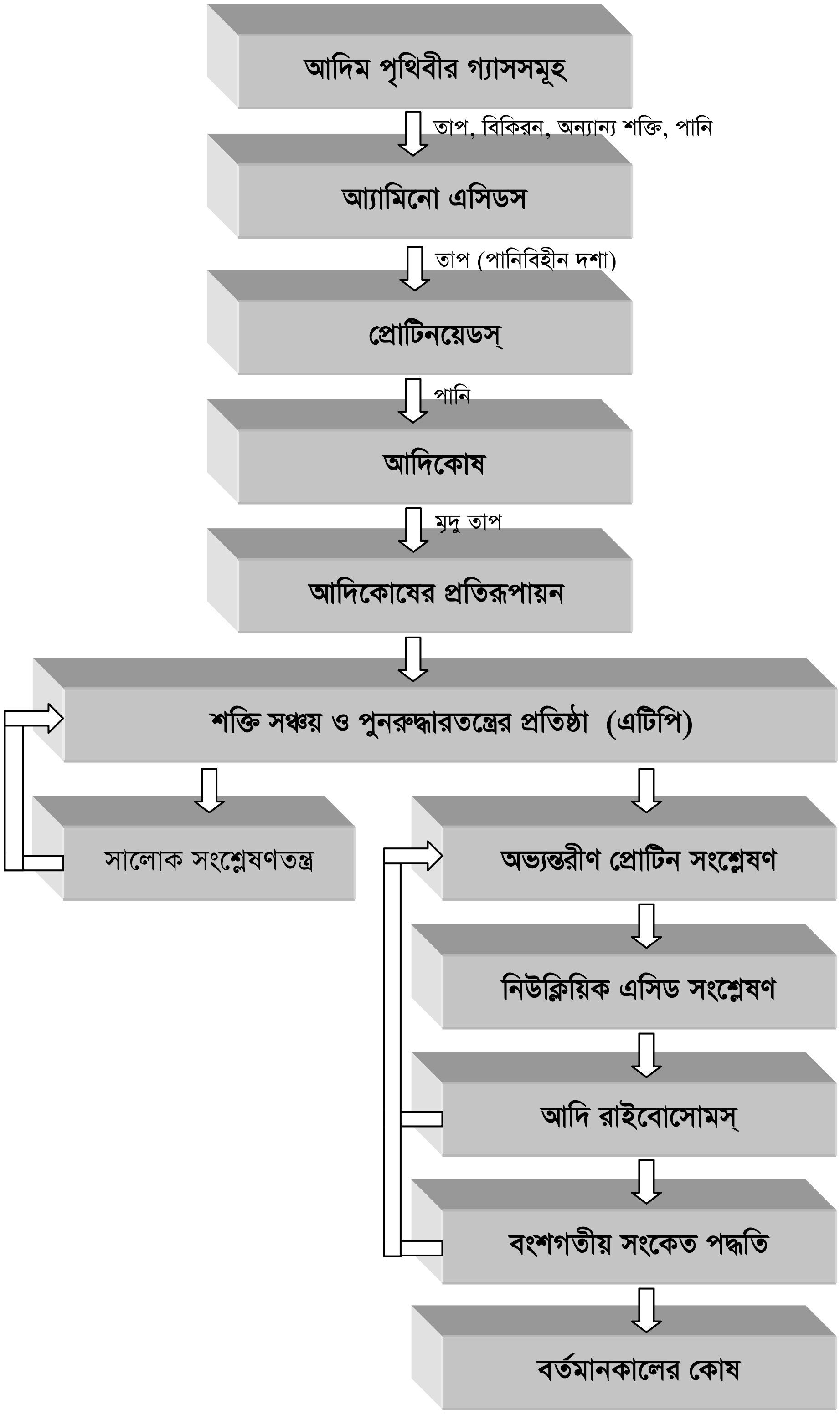
***ধাপ-৫:*** **আদি কোষ বা ইউবায়োন্ট গঠন** (কো-এসারভেটের ভিতরে নিউক্লিয়োপ্রোটিন আর অন্যান্য অণু একত্রিত হয়ে লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি দিয়ে আবদ্ধ প্রথম কোষ; প্রথম জীবন)

***ধাপ-৬:*** **শক্তির উৎস ও সরবরাহ** (শক্তির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায়, প্রকৃতিতে টিকে রইল তারাই যারা প্রোটিনকে এনজাইমে রূপান্তরিত করে সরল উপাদান থেকে জটিল বস্তু তৈরী করতে পারত, আর সেসব দ্রব্য থেকে শক্তি নির্গত করতে পারত)

***ধাপ-৭:*** **অক্সিজেন বিপ্লব** (অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনময় জারকীয় আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হল - আজ থেকে দু'শ কোটি বছর আগে)

***ধাপ-৮:*** **প্রকৃত কোষী জীবের উৎপত্তি** (প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওট)

***ধাপ-৯:*** **জৈব-বিবর্তন বা Biogeny** (জীব থেকে জীবে বিবর্তন)



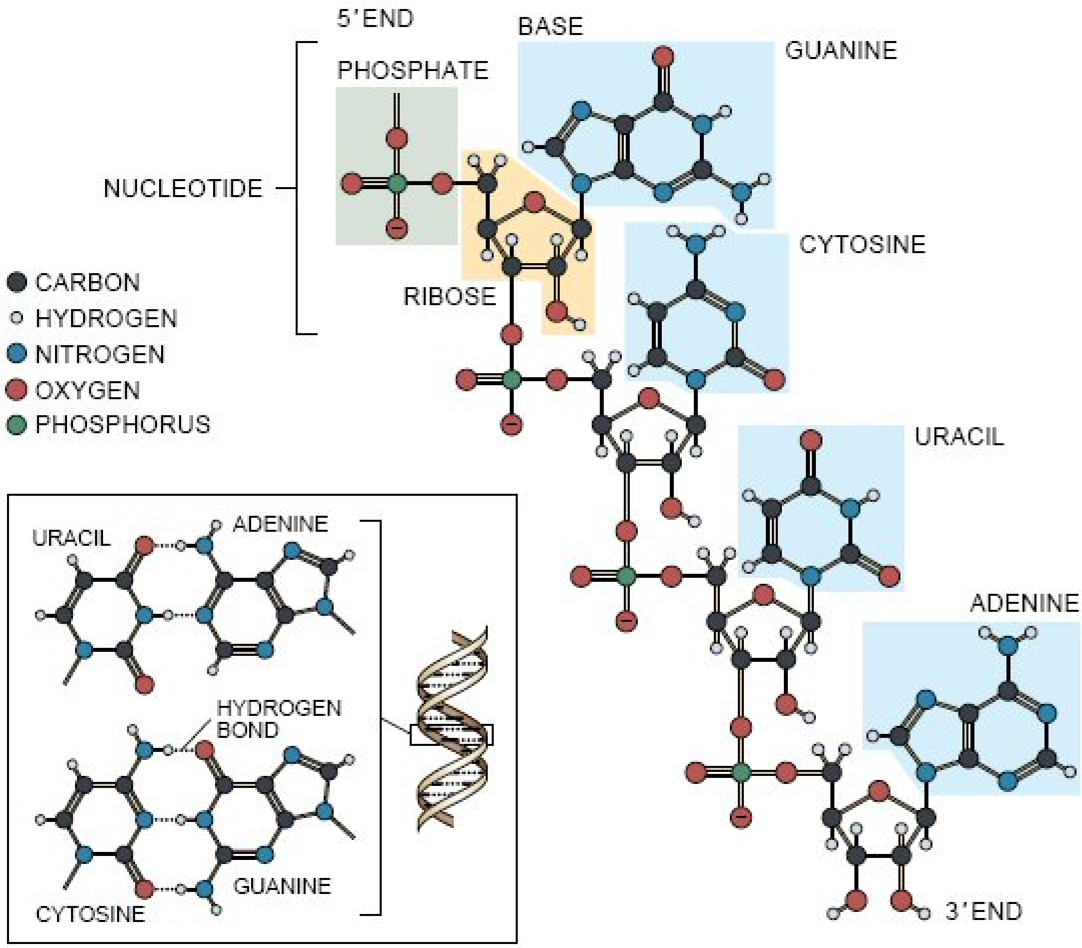

**চিত্র ৫.২ :** আদিম পরিবেশ থেকে জৈববস্তুর উৎপত্তি ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক ও বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবনের উৎপত্তির রূপরেখা (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৮)

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক পরিবর্তনের এই ধাপগুলো কিন্তু একদিনে সম্পন্ন হয়নি। প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড স্বতঃস্ফুর্তভাবে নানা ধরনের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশে সংগবদ্ধ হয়েছে লক্ষ কোটি বছর ধরে। প্রকৃতি নিজেই নিজের উপর আকস্মিকতার পরীক্ষা (chance experiment of nature) করেছে বিস্তর। ফলে অজৈব পদার্থ থেকে একসময় উদ্ভুত আদি কোষগুলো নিউক্লিয়িক এসিডের সমন্বয়ে অনুলিপির ক্ষমতা অর্জন করেছে, আর সময়ের সাথে সাথে বিবর্ধিত করেছে। আসলে সহজ কথায় সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে জটিলতা। এই জটিলতা বৃদ্ধিই জীবন বিকাশের এক অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। জটিলতার অর্থ সংবাদ বা তথ্যের বৃদ্ধি। যে অণু যত সরল ও ছোট, তার ভিতরকার সংবাদ ও তথ্য তত কম। অণু যত দিনে দিনে বৃহৎ আকার অর্জন করেছে, এক থেকে বহুত্ব অর্জন করেছে, ছোট কণা থেকে বড় কণায় রূপান্তরিত হয়েছে- বৃদ্ধি করেছে জটিলতার। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন বিকাশের আগে দরকার ছিল জটিলতা বৃদ্ধির। জটিলতা বাড়তে বাড়তে যখন জীবনোপযোগী পরিবেশ তৈরী হল, অর্থাৎ তথ্যের পাহাড় জমল, তখনই শুরু হল প্রকৃত জীবন। প্রকৃত জীবন পারল স্বপুনরাবৃত্তির ক্ষমতা অর্জন করতে; শিখল বহিঃস্থ তথ্যকে ব্যবহার করতে। কাজেই বলা যায়, জটিলতাই হচ্ছে জীবনের ভিত্তি। উপরে একটি প্রবাহচিত্রের সাহায্যে আরেকটু সহজভাবে জীবনের উৎপত্তির প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরা হয়েছে (চিত্র ৫.২)।

জটিলতা বৃদ্ধির ব্যাপারটি আরো পরিস্কার হবে আজকের দিনের কোষগুলোর সাথে আদি কোষ বা 'প্রটোসেল'-এর তুলনা করলে। আদি কোষগুলোতে কোন জেনেটিক তথ্য ছিল না; অর্থাৎ ছিল না কোন ডিএনএ এবং আরএনএ, যা আজকের দিনের কোষগুলোর একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। কিভাবে তাহলে একসময় উৎপন্ন হল এই ডিএনএ এবং আরএনএ-এর?

এ প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলা যাক। আমরা আজ জানি যে, সমস্ত জীবিত বস্তু, সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণিই হোক, তার প্রকৃতি নির্দেশিত হয় বংশগতির বাহক - 'জীনের' কতকগুলো জটিল রাসায়নিক অণুর অঙ্গুলি হেলনে। জীনের এই রাসায়নিক অণুগুলো হল ডিএনএ এবং আরএনএ; এই দুই হারমোনিয়াম আর সেতারের সমন্বিত সংযোগেই রচিত হয়েছে আমাদের জীবন-সঙ্গীতের সুর। ডিএনএ হচ্ছে *ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড* এবং আরএনএ হল *রাইবোনিউক্লিয়িক এসিডের* সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রতিটি ডিএনএ-তে থাকে চার রকমের নাইট্রোজেনাস বেসের সরল অণু - A, G, C, T। আবার প্রত্যেক আরএনএ অণুতেও থাকে চার রকমের বেস- A, G, C, U। T এবং U এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু বৈসাদৃশ্যও কম নয়। আর জীবনের রসায়নে সামান্য তফাতের পরিনামও কিন্তু হতে পারে বিশাল। এই ডিএনএ এবং আরএনএ যেমন নির্ধারণ করছে আমার মাথায় কোকরানো চুল কেন, আর ফুটবলার জিদানের মাথায় টাক কেন, তেমনিভাবে বলে দিচ্ছে চিতাবাঘের গায়ে কালো ফুটকি কেন, আর কেনই বা তাল গাছ এত লম্বা! হাজার হাজার কোষ দিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের দেহ। জটিলতার পথ

বেয়ে এমনভাবে কোষগুলো বিবর্তিত হয়েছে যে সামান্য অতিক্ষুদ্র একটা কোষে জীবনের সমস্ত জটিল তথ্যগুলো সন্নিবেশিত থাকে। এই জটিল তথ্যগুলোকেই বিজ্ঞানীরা বলছেন - *ব্লু প্রিন্ট অব লাইফ*।




**চিত্র ৫.৩ :** নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরী আরএনএ

যদিও এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই ব্লু প্রিন্টের রহস্য বিজ্ঞানীরা অনেকটাই সমাধান করে ফেলেছেন, তারপরও একটি সমস্যা নিয়ে তারা বরাবরই হিমশিম খেয়েছেন। কিভাবে আদি কোষে আরএনএ এবং ডিএনএ-এর মত বংশাণুসৃত দ্রব্যের অভ্যুদয় ঘটলো? প্রোটিন অণুগুলোর অভ্যুদয় আগে ঘটেছিলো, নাকি নিউক্লিয়িক এসিডের (আরএনএ / ডিএনএ)? এ অনেকটা যেন 'ডিম আগে নাকি মুরগী আগে' ধরণের সমস্যা। কারণ, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আজকের প্রোটিন অণু তৈরী করতে নিউক্লিয়িক এসিডের প্রয়োজন। আবার নিউক্লিয়িক এসিড তৈরী করতে দরকার এনজাইম - যেগুলো মূলতঃ প্রোটিন ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে কোন্‌টির

অভ্যুদয় আগে ঘটেছিল - প্রোটিন নাকি নিউক্লিয়িক এসিডের? এর দুটি সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে। আদিমকালে প্রোটিন তৈরী হয়েছিল আগে, তারপর সরলতর প্রোটিন থেকে যখন আরএনএ/ডিএনএ'র উদ্ভব হয়েছিল, তখন হয়ত কোন এনজাইমের সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। প্রিন্সটন ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি'র অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফ্রিম্যান ডাইসন এই 'প্রোটিন আগে' (protein-first) তত্ত্বের একজন জোরালো প্রবক্তা। তত্ত্ব দিলে কি হবে, এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বের করতে পারেননি যে কিভাবে ওই আদি প্রোটিনগুলো প্রতিরূপায়নের (replication) ক্ষমতা অর্জন করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি স্যান ডিয়াগোর স্ক্রিপস ইন্সটিটিউটের রেজা ঘাদিরি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে কিছু পেপটাইডের শিকল সত্যি সত্যি প্রতিরূপায়ন ঘটাতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রতিরূপায়ন ঘটাতে গিয়ে ঘটা ভুলের সংশোধনও করতে চেষ্টা করে; দেখে মনে হয় সত্যই এগুলোর ভিতর 'মন বলে কোন কিছু আছে' (Cohen, 1996)! এ ছাড়া 'ম্যাড কাউ' রোগের উৎস হিসেবে যে প্রিয়নের কথা আমরা একটু আগে জেনেছি তারাও তো স্রেফ প্রোটিন দিয়ে তৈরী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের প্রতিলিপি তৈরী করে রোগ ছড়াতে পারছে। আরেকটি সম্ভাব্য সমাধান হচ্ছে সেই যে তথাকথিত 'আরএনএ পৃথিবীর' ধারণা, যেটি ইদানিং বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ছে। ষাটের দশকে কার্ল উস, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং লেসলি অর্গেল পৃথকভাবে প্রস্তাব করেন যে, প্রোটিন এবং ডিএনএ তৈরীর আগে আরএনএ-ই প্রথম তৈরি হয়েছিল এবং গঠন করছিল সেই আরএনএ পৃথিবী (RNA world)। এ শুধু কল্পনা নয়। আজকের পৃথিবীতেও অনেক তামাকের মোজাইক এবং সরল ভাইরাস পাওয়া যায়, যাতে ডিএনএ-এর ছিটেফোঁটাও নেই, পুরোটাই আরএনএ। আদিম পৃথিবীতে এই আরএনএ-গুলো জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করত এবং নিজেদের প্রতিরূপায়ন (replication) ঘটাতে পারত। শুধু তাই নয়, ধারণা করা হয় যে, সে সময় আরএনএ অ্যামাইনো এসিডের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রোটিনের অণুও গঠন করতে পারত। এ হতেই পারে, কারণ ধারণা করা হয় যে আদিম পৃথিবীর আরএনএ-এর দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা আজকের পৃথিবীতে নেই : এক - প্রোটিনের সাহায্য ছাড়াই প্রতিরূপায়ন করার ক্ষমতা, এবং দুই - প্রোটিন সংশ্লেষনের প্রতিটি ধাপকে অনুঘটিত (catalyze) করার ক্ষমতা। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন ডিএনএ অণু তৈরী হয়েছে পরে।

প্রোক্যারিওট বা আদিকোষের যখন উদ্ভব ঘটেছিল তখন তাদের বিবর্তন হচ্ছিল বিভিন্ন রূপে। কোনটার হয়তো চলফেরা করার জন্য সুগঠিত ফ্লাজেলা ছিল, কোনটা হয়ত ছিল বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার ব্যাপারে পারদর্শী, আবার কোনটার শরীরে হয়ত ছিল ক্লোরফিল। কোন এক সময়ে চলমান একটা প্রোক্যারিওট হয়তো কোন একভাবে এসে মিশেছিল অক্সিজেনবাহী প্রোক্যারিওটের সাথে অথবা ক্লোরফিলবাহী একটা প্রোক্যারিওটের সাথে, কিংবা হয়ত একসঙ্গে

দুটোর সাথেই। এই রকম মেশামেশির ফলে যে জিনিসটা তৈরী হল তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মোকাবেলায় একক প্রোক্যারিওটের চেয়ে অনেক দক্ষ হবে। সংঘবদ্ধ হলে যে দক্ষতা বাড়ে তা তো শুধু জৈব জগতে নয়, সামাজিক জীবনেও প্রমাণিত। পিঁপড়ের ঢেলা, উইয়ের বাসা কিংবা মৌমাছির চাকগুলোর দিকে তাকান। সংঘবদ্ধতার উৎকর্ষতা হাতে নাতে পেয়ে যাবেন। গরিলা কিংবা হাতীর মত স্তন্যপায়ী জীবেরা যে দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে তা বলাই বাহুল্য। আর সংঘবদ্ধতার শ্রেষ্ঠতম নমুনা তো আমাদের মানব সমাজ। কাজেই সংঘবদ্ধতার কারণেই প্রোক্যারিওটদের উপনিবেশগুলোই টিকে থাকলো আর বাড়বাড়ন্ত হলো এদের।

এ ধরনের মেশামিশি করতে গিয়েই আজ থেকে ১৪০ কোটি বছর আগে বিভিন্ন রকমের প্রোক্যারিওটের সংমিশ্রনে ইউক্যারিওট বা প্রকৃতকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। ইউক্যারিওটীয় কোষগুলো যে বহু প্রোক্যারিওটীয় কোষের সমষ্টি তা লিন্ মাগোর্লিস (১৯৩৮-) খুব জোরের সাথে সমর্থন করেন। ধারণা করা হয় প্রোক্যারিওটরা একে অপরের সাথে জুড়ে জুড়ে যখন ক্রমশ বড় থেকে আরো বড় কোষ তৈরী করেছিল, তখন তাদের আয়তন ও জেনেটিক পদার্থের পরিমানও গেল বেড়ে। দেখা গেল ক্রোমোজোমগুলো গোটা কোষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে কোষ বিভাজন ঘটা মুশকিল। তাই যে সব মিশ্রিত-প্রোক্যারিওটগুলোর ক্রোমাটিন ছোট নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত ছিল প্রকৃতি তাদের বাড়তি সুবিধা দিল-ফলে তারাই সে সময় ভালভাবে টিকেছে এবং কালের ধারাবাহিকতায় একসময় মিশ্রিত-প্রোক্যারিওটগুলো পরিণত হয়েছে ইউক্যারিওটে। ১৯৫৪ সালে মার্কিন জীবাশ্মবিদ এলসো স্টেরেনবার্গ বার্গ্‌হন্ উত্তর আমেরিকার অন্টারিও প্রদেশের দক্ষিণ দিকে প্রাচীন পাথরের বুকে সর্বপ্রথম এই ধরণের আদি ইউক্যারিওটের খোঁজ পান। তারপর থেকে এধরণের বস্তু এত দেখা গেছে যে এগুলো অতি আদিম ইউক্যারিওট তা নিয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে ইউক্যারিওট- তা এক ধরনের শৈবাল; এদের নাম দেওয়া হয়েছে *আক্রিটার্ক্*। এদের বয়স প্রায় ১৪০ কোটি বছর।

সবচেয়ে প্রাচীন যে প্রোক্যারিওটের সন্ধান এ পৃথিবীতে পাওয়া গেছে তা সম্ভবতঃ ৩৬০ কোটি বছরের পুরোন। তার মানে পৃথিবীর বয়স যখন মোটামুটি ১০০ কোটি বছর পেরিয়েছে তখন থেকেই প্রাণের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে ছিল, অন্ততঃ প্রোক্যারিওট-রূপে। ২০০ কোটি বছরেরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীতে জীব বলতে ছিল শুধু তারাই। কোষ-ওয়ালা যাবতীয় জীবের অস্তিত্ব যতদিন, এই সময়টা তার অর্ধেকেরও বেশী। ৩৬০ কোটি বছরের পুরোন প্রোক্যারিওটের সন্ধান বিজ্ঞানীরা যেখানে পেয়েছেন সেখানে তারা চ্যাপটা জটবাধা আর ভিতরে পলিপড়া নানান জৈব স্তরের সৃষ্টি করেছে। এগুলোর নাম হল *স্ট্রোমাটোলাইট* (গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল

'বিছানার চাদর')। নীচে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া স্ট্রোমাটোলাইটের ছবি দেখানো হয়েছে (চিত্র ৫.৪) ।



**চিত্র ৫.৪ :** অস্ট্রেলিয়ার শার্ক অববাহিকায় গড়ে ওঠা স্ট্রোমাটোলাইটের ছবি। লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জে উইলিয়াম স্কোফ ৩৬০ কোটি বছরের পুরোন স্ট্রোমাটোলাইটের ধবংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছেন । ৩৫০ কোটি বছরের পুরোন জীবাশ্মের সাথে আধুনিক সায়নোব্যাকটেরিয়ার মিল পাওয়া যায়।

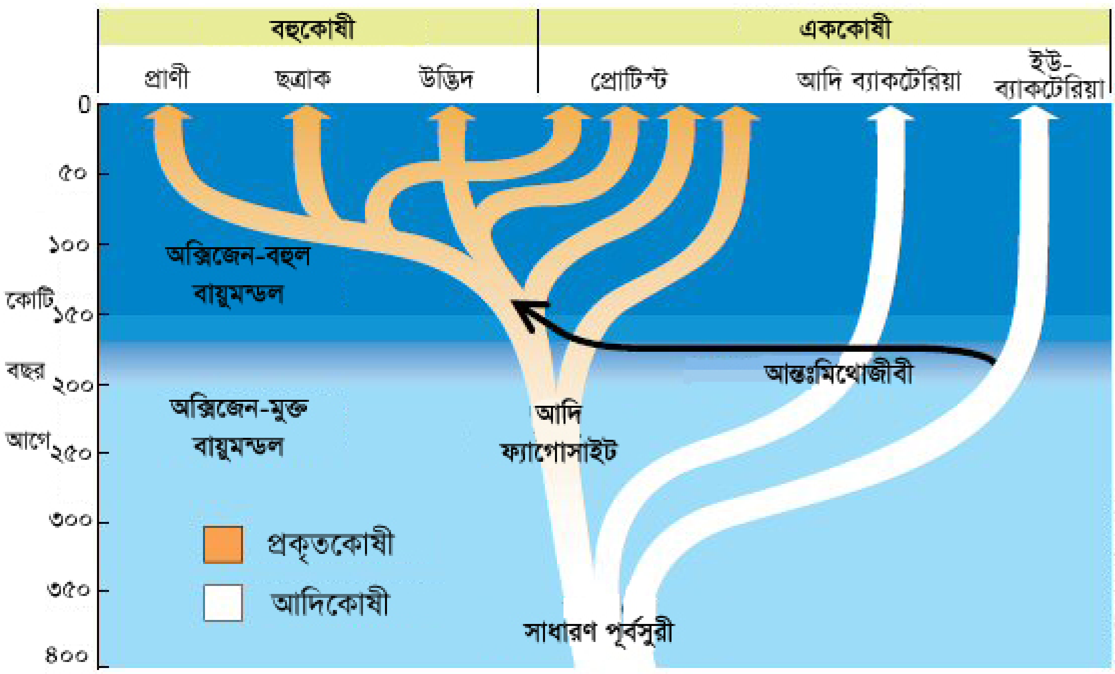
জীবনের সূচনার ধাপগুলোর দিকে আরেকটিবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :

১) প্রথমে তৈরী হল ছোট্ট একটা একতন্ত্রী আরএনএ অণু - এনজাইমের সাহায্য ছাড়া প্রতিরূপায়ণে এবং সরল প্রোটিন অণু তৈরীর ক্রিয়ায় অণুঘটক হিসেবে সেটি কাজ করতে সক্ষম।

২) যে সব প্রোটিন অণু এই আরএনএ-এর ঘটকালিতে তৈরী হল, তাদের সংস্পর্শে এল এই আরএনএ, তাতে আরএনএ অণুর স্থায়িত্ব বেড়ে গেল। এই অণু তখন আরো লম্বা হতে পারলো, প্রতিরূপায়নেও আরো দক্ষ হল।

৩) আরএনএ থেকে ডিএনএ অণু তৈরী হল, হয়ত আরএনএ-এর প্রতিরূপায়নে কিছু ভুলের কারণে। কিন্তু দেখা গেল এই অণু আরএনএ-এর চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী, এর বেনী অনেক লম্বা, তথ্য এতে অনেক নিরাপদে সঞ্চিত থাকে; প্রতিরূপায়নে ঝামেলা এবং ভুল দুই-ই কম হয়। প্রোটিনের সাথে সহাবস্থানের কারণে ক্রমশঃ এর আকার জটিলতর হল, এবং এদের কার্যকারিতাও বাড়তে থাকল।

৪) ভাইরাসের মত সরল কোষী জীবের অভ্যুদয় ঘটল, তারপর তাদের ক্রমবিকাশের ফলে তৈরি হল প্রোক্যারিয়োট বা আদিকোষের, তা থেকে একসময় জন্ম নিল ইউক্যারিওট বা প্রকৃতকোষী জীবের। তা থেকে অন্য সমস্ত জীব।



**চিত্র ৫.৫ :** জীবনের পল্লবিত বৃক্ষ : প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তনের রেখচিত্র

## সম্ভাবনার জগৎ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন:

অনেকেই মনে করেন, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি স্রেফ একটা দুর্ঘটনা বা চান্স। ঘটনাচক্রে দৈবাৎ (by chance) প্রাণের উল্লম্ফন ঘটেছে । এ যেন অনেকটা হঠাৎ লটারী জিতে কোটিপতি হওয়ার মতই একটা ব্যাপার। বিজ্ঞানী মুলার এ ধরনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। কম সম্ভাবনার ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। অহরহই তো ঘটছে। ভূমিকম্পে বাড়ী-ঘর ধবসে পড়ার পরও অনেক সময়ই দেখা গেছে প্রায় 'অলৌকিক'ভাবেই ভগ্নস্তুপের নীচে কেউ বেঁচে আছেন। নিউইয়র্ক টাইমস-এ একবার এক মহিলাকে নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল যিনি দু দুবার নিউজার্সি লটারির টিকেট জিতেছিলেন। তারা সম্ভাবনা হিসেব করে দেখেছিলেন ১৭ ট্রিলিয়নে ১। এত কম সম্ভাবনার ব্যাপারও ঘটছে। কাজেই প্রাণের আবির্ভাব যত কম সম্ভাবনার ঘটনাই হোক না কেন, ঘটতে পারেই।

কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের কাছে স্রেফ সম্ভাবনার মার-প্যাঁচ থেকেও ভাল উত্তর আছে, প্রাণের আবির্ভাবের পেছনে। সেটি কী, তা বলবার আগে আমাদের প্রাণের উন্মেষের সম্ভাবনাটি হিসেব করা যাক। ধরা যাক, আমাদের গ্যালাক্সিতে $১০^{১১}$ টি তারা আর $১০^{৬০}$ টি ইলেকট্রন আছে। দৈবাৎ এ ইলেকট্রনগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের গ্যালাক্সি, কোটি কোটি তারা, আমাদের পৃথিবী এবং শেষ পর্যন্ত এই একটি মাত্র গ্রহে উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম কোষটি গঠনের সম্ভাবনা কত? আমাদের গ্যালাক্সি এবং পৃথিবীর যে বয়স, তা কি ওই সম্ভাবনা সফল করার জন্য যথেষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। কারণ এই সম্ভাবনা মাপতে গেলে যে হাজারটা চলক নিয়ে কাজ করতে হয়, তার অনেকগুলো সম্বন্ধে আমরা এখনও অনেক কিছু ঠিকমত জানি না। তবে কৃত্রিম একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। কেয়রেন্স-স্মিথ (Cairns-Smith, 1970) এমনি একটি কৃত্রিম উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ধরা যাক একটা বানরকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হল। তারপর তার সামনে ডারউইনের 'প্রজাতির উৎপত্তি' নামক বইটি খুলে এর প্রথম বাক্যটি টাইপ করতে দেয়া হল। বাক্যটি এরকম :

> When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with certain facts in the distribution of the inhabitants of South America, and in the geological relations of the present to the past inhabitants of that continent.

এই লাইনটিতে ১৮২ টি অক্ষর আছে। বানরটিকে বলা হল এই লাইনটিকে সঠিকভাবে কাগজে ফুটিয়ে তুলতে। এখন বানর যেহেতু অক্ষর চিনে না, সেহেতু সে টাইপ্রাইটারের চাবি অন্ধভাবে টিপে যাবে। টিপতে টিপতে দৈবাৎ একটি শব্দ সঠিক ভাবে টাইপ হতেও পারে। কিন্তু একটা শব্দ টাইপ হলে চলবে না, পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে যেমনিভাবে লেখা আছে - ঠিক তেমনিভাবে- টাইপ হতে হবে। মানে শুধু সবগুলো শব্দ সঠিক ভাবে টাইপ নয়, এর ধারাবাহিকতাও রাখতে হবে। এখন এই বানরটির এই বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করার সম্ভাবনা কত? কত বছরের মধ্যে অন্ততঃ একবার হলেও বানরটি সঠিকভাবে বাক্যটি টাইপ করতে পারবে? সম্ভাবনার নিরিখে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

মনে করা যাক যে, টাইপরাইটারটিতে ৩০ টি অক্ষর আছে এবং বানরটি প্রতি মিনিটে ৬০ টি অক্ষর টাইপ করতে পারে। শব্দের মধ্যে ফাঁক-ফোকর গুলো আর বড় হাত-ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্য এই গণনায় না আনলেও, দেখা গেছে পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করতে সময় লাগবে $১০^{৮০}$ বছর, মানে প্রায় অনন্তকাল! কিন্তু যদি এমন হয় যে, একটি সঠিক শব্দ লেখা হবার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে রাখা হয়, আর বাকী অক্ষরগুলো থেকে আবার

নির্বাচন করা হয় বানরের সেই অন্ধ টাইপিং এর মাধ্যমে, তবে কিন্তু সময় অনেক কম লাকবে, তারপর ১৭০ বছরের কম নয়। কিন্তু যদি এই নির্বাচন শব্দের উপর না হয়ে অক্ষরের উপর হয়ে থাকে (অর্থাৎ, সঠিক অক্ষরটি টাইপ হওয়ার সাথে সাথে এটিকে আলাদা করে রেখে দেয়া হয়); তবে কিন্তু সময় লাগবে মাত্র ১ ঘন্টা, ৩৩ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড। ১৯৮০র দিকে গ্লেনডেল কলেজের রিচার্ড হার্ডিসন একই ধরনের একটি কৃত্রিম বাক্যাংশ নির্বাচনের কম্পিউটর প্রোগ্রাম তৈরী করে তাতে দেখান যে র‍্যান্ডমলি বাক্যাংশ নির্বাচন করে শেক্সপিয়রের গোটা হ্যামলেট নাটিকাটি সারে চার দিনে একেবারে অগোছালো অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা সম্ভব।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই জীবজগতেও এই অক্ষর নির্বাচনের মতই একধরনের নির্বাচন সৃষ্টির শুরু থেকেই চলে আসছে, এটাকে বলে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটা কিন্তু ভারী মজার। রোমান্টিক ব্যক্তিরা হয়ত এর মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পাবেন। জীব জগতে স্ত্রীই হোক আর পুরুষই হোক কেউ হেলা ফেলা করে মেশে না। মন-মানসিকতায় না বনলে, প্রকৃতি পাত্তা দেবে মোটেই। প্রকৃতির চোখে আসলে লড়াকু স্ত্রী-পুরুষের কদর বেশী। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতি যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নেয় আর অযোগ্য প্রতিদ্বন্দীকে বাতিল করে দেয়, ফলে একটি বিশেষ পথে ধীর গতিতে জীবজন্তুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স, এই 'ন্যাচারাল সিলেকশন' বা প্রাকৃতিক নির্বাচনকে 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তার 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার' বইয়ে বলেন (Dawkins, 1996) :

> "Natural selection, the unconscious, automatic, blind yet essentially non-random process that Darwin discovered, has no purpose in mind. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the blind watchmaker."

অধ্যাপক ডকিন্সসহ অনেক জীববিজ্ঞানীই মনে করেন, স্রেফ 'চান্স' নয়, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব আর বিকাশ ঘটেছে আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে। তাই সময় লেগেছে অনেক কম। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া বিবর্তন হলে জীবজগৎ এত কম সময়ে এভাবে বিবর্তিত হত না।

## স্বতঃজননবাদ বনাম জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব

জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বকে কিন্তু লুই পাস্তুর কর্তৃক পরিত্যক্ত স্বতঃজনন তত্ত্বের সাথে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বটি কাজ করে ধাপে ধাপে রাসায়নিক পরিবর্তন এবং জটিলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে। প্রাক-জীবনপূর্ব সময়ে আনবিক স্তরেও হয়ত চলেছিল

'প্রাকৃতিক নির্বাচনের খেলা' যাকে এখন 'আণবিক নির্বাচন' (molecular selection) নামে অভিহিত করা হয় (Fox, 1998)। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে বহু 'সিমুলেশন পরীক্ষা' করেছেন, যার মাধ্যমে এ তত্ত্বের বাস্তবতা ইতোমধ্যেই নানা ভাবে প্রমাণিত হয়েছে (Spiegelman, 1967; Eigen and Schuster, 1979; Julius Rebek, 1994, Cohen, 1996)। অথচ সৃষ্টিবাদীরা (Creationists) এ বিষয়টিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন এবং সোজা সাপটা বলতে চান যে রাসায়নিক বিবর্তন তত্ত্ব সরাসরি ওই ঘরের কোনায় ফেলে রাখা ঘর্মাক্ত কাপড় চোপর থেকে ইঁদুর কিংবা লবনাক্ত পানিতে ফেলে রাখা ফার থেকে রাজহাঁস উৎপন্ন হবার কথা বলছে, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুই পাস্তুর ভুল প্রমাণ করেছেন (তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ)।

প্রশ্ন উঠতেই পারে আদি পৃথিবীতে যদি জড় থেকে জীবের উদ্ভব ঘটে থাকে, তাহলে এ ধরণের ঘটনা আজ ঘটছে না কেন? এর উত্তর হচ্ছে আদিমকালে পৃথিবীর অবহমন্ডলের অবস্থা আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। তাই এখন যে বাধা অনতিক্রম্য বলে মনে হয়, তখন হয়ত তা ছিল না। যেমন আজকের পৃথিবীতে রয়েছে প্রচুর অক্সিজেন, অথচ আদিম কালের পৃথিবীর আবহমন্ডলে অক্সিজেন প্রায় ছিল না বললেই চলে। শুধু একারণেই ঘটতে পারে বিশাল পার্থক্য (আসিমভ, ২০০৬)।

আর তা ছাড়া যদি ধরেও নেই এখনো রাসায়নিক বিবর্তনে জীবনের উদ্ভব ঘটছে সেগুলোকে প্রথমতঃ বিদ্যমান প্রাণ থেকে পৃথক করা কঠিনই হবে (Berra, 1990)। আর দ্বিতীয়তঃ এর ফলে প্রাক-জীবনধারী যে সমস্ত জিনিস এ পৃথিবীতে তৈরী হবে, সেগুলো অজস্র জীবের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে নিমেষের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে প্রাকৃতিক নিবার্চনে এগুলোর টিকে থাকার কথা নয়। অথচ আদিম পৃথিবীতে অন্য প্রাণী যখন ছিল না, তখন এই প্রাক জীবনধারীরা বিকশিত হতে পারতো অবাধে।

আমরা অগামী পর্বে একটা কৌতুহোদ্দীপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। জীববিজ্ঞানের এক অদ্ভুত শাখা আছে, এর নাম 'Exobiology', যার বাংলা করলে বলতে পারি মহাকাশ জীববিদ্যা। আমাদের এ পৃথিবী ছাড়াও অন্য কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা, কিংবা এর সম্ভাব্যতা কতটুক এটি হবে আগামী অধ্যায়গুলোর আলোচ্য বিষয়।

পুনর্লিখন : অক্টোবর ২, ২০০৬

---

{পঞ্চম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে বিজ্ঞান (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# ভিন গ্রহে প্রাণ এবং বুদ্ধিমত্তার খোঁজে

## (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –৬)

ফরিদ আহমেদ

মহাবিশ্বে মহাকাল- মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

### ওই যে সুদূর নীহারিকায়

মানব সভ্যতা বিকাশের বহু বহু আগে, সুপ্রাচীন কালে, কোন এক শ্বেতশুভ্র মায়াবী পুর্ণিমা রাতে, হয়তো আমাদেরই কোন এক পুর্বপুরুষ অসীম কৌতুহল নিয়ে মাথা তুলে তাকিয়েছিল সুবিস্তৃত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে। অপরিণত বুদ্ধিমত্তা আর সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিল এই বিশ্বব্রহ্মান্ডসহ নিজের উৎপত্তির অপরিসীম রহস্যকে। রহস্যের কূল কিনারা করতে পারুক আর নাই পারুক, দুর্দমনীয় এই কৌতুহলকে আমাদের সেই পুর্বপুরুষ খুব সফলভাবেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। আদি পুরুষের সেই অনুসন্ধিৎসা উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ এখনো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজন্ম তার রক্তের মধ্যে। তাই হয়তো অজানাকে জানা আর রহস্য উন্মোচনে মানুষ দুর্দমনীয়, ক্লান্তিহীন। নাছোড়বান্দার মতো 'সৃষ্টির' আদি এবং অন্তকে ছিড়ে খুঁড়ে ব্যবচ্ছেদ করার অদম্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নিরন্তর। কোথা থেকে বিশ্বজগতের সূত্রপাত আর কোথাই বা শেষ, কোন্ অমর্তলোক থেকে যাত্রা আমাদের, কেনই বা আমরা এই পৃথিবীতে, কিই বা এর উদ্দেশ্য এহেন হাজারো কৌতুহল আর উত্তরহীন জিজ্ঞাসা মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে শতাব্দী থেকে শতাব্দী। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ যখনই জেনেছে যে, রাতের আকাশের আলোকরাজী আর কিছুই নয় বরং আমাদের সুর্যের মতোই অগুণতি সুর্যের সমাহার, তখনই সচেতনভাবে মানুষের চিন্তায় এসেছে, অনন্ত অসীম এই মহাবিশ্বে তাহলে কি শুধু আমরাই আছি? নাকি আমাদের দৃষ্টি এবং বোধসীমার বাইরে সুবিস্তৃত বিশ্বজগতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমাদেরই মতো বা আমাদের চেয়েও উন্নত অসংখ্য সভ্যতা?

মেঘহীন পরিষ্কার আকাশে খালি চোখে আমরা মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই, যা প্রকৃত সংখ্যার অতি নগন্য অংশ মাত্র। শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথেই নক্ষত্রের

সংখ্যা চারশ বিলিয়নের মতো। হাবল মহাকাশ টেলিস্কোপের মাধ্যমেই পঞ্চাশ থেকে একশ' বিলিয়ন ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। সুবিশাল এই মহাবিশ্বের অনন্ত নক্ষত্রমালার কোন কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা আর যাই হোক না কেন অসম্ভব যে নয় তা যে কোন একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ যা অনুকুল পরিবেশ পেলেই বিকশিত হয়ে উঠে। আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, উৎপত্তির পর তুলনামুলকভাবে খুব কম সময়েই পৃথিবীতে 'প্রাণ' তার আগমনী সংগীত গেয়েছে। কাজেই একই ধরনের পরিবেশ পেলে, যে সমস্ত নক্ষত্র আমাদের সুর্যের মতো সেগুলোর গ্রহতেও প্রাণের বিকাশ ঘটা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়।

পৃথিবী নিঃসন্দেহে প্রাণের এক উর্বর বিচরণভূমি । ফল্গুধারার মতো বিকশিত হয়েছে প্রাণ এখানে। যে দিকে তাকানো যায় শুধু প্রাণ আর প্রাণ। বিচিত্র সব প্রাণের সমাহারে নন্দিত আমাদের এই বসুন্ধরা। কিন্তু সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে জন্ম নেওয়া এই ধরনী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাণের জন্য মোটেই সৌহার্দ্যমূলক ছিলনা। প্রথম এক বিলিয়ন বছর বা তার কিছু সময় পর পৃথিবীতে গলিত প্রস্তর এবং এসিডের মহাসাগরে স্থিতিবস্থা আসে। জীববিজ্ঞানীরা সাড়ে তিন বিলিয়ন বছরের পুরনো স্তরীভূত প্রস্তর উদ্ধার করেছেন যার মধ্যে পাওয়া গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী সায়ানোব্যকটেরিয়ার (Cyanobacteria) ফসিল (পঞ্চম অধ্যায়, চিত্র ৫.৪ দ্রষ্টব্য)। এই সরল প্রাণের সুদীর্ঘ বয়সই প্রমাণ করে পৃথিবীর উৎপত্তির মাত্র এক বিলিয়ন বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল। এতো সহজেই যদি পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারে তবে সুবিশাল এবং সুবিস্তৃত মহাবিশ্বের অন্য কোথাও যে এর বিকাশ হয়নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়!

## চরমজীবীদের রাজত্বে

ষাটের দশকে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী টমাস ব্রক (Thomas Brock) এবং তার সহকর্মীরা ওয়াইওমিং এর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ প্রস্রবনে এক ধরনের সরলাকৃতির অণুজীব (Microbes) আবিষ্কার করেন। বেশীর ভাগ জটিল কোষী প্রাণীই এই তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে না। যে সমস্ত 'প্রাণ' এই ধরনের ভয়ংকর বৈরি পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তাদেরকে বলা হয় চরমজীবী (Extremophile)। পৃথিবীতে বেশ কয়েক ডজন চরমজীবীর অস্তিত্ব রয়েছে। কিছু কিছু চরমজীবী আছে যারা পৃথিবীর যে কোন পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম।

জীববিজ্ঞানীরা এন্টার্কটিকার লেক ভোস্টক এবং সাইবেরিয়ার জমাট বরফের মধ্যেও অণুজীব খুঁজে পেয়েছেন। কিছু অণুজীব আবার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এসিডিক বা বেশি ক্ষারীয় পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। অতিরিক্ত লবনাক্ততা যে কোন প্রাণীর জন্যেই ক্ষতিকর, অথচ কিছু অণুজীব আছে যারা তেল খনির বা লবনের খনির মধ্যেও বসবাস করে। চিলির আটাকামা মরুভমি যেখানে গত ১০০ বছরেও বৃষ্টি হয়নি সেখানেও বহাল তবিয়তে বেঁচে বর্তে আছে কিছু কিছু অণুজীব। আমরা যখন এ বইটি লিখছি ঠিক সেসময় 'ওয়ার্ল্ড সায়েন্স' (অক্টোবর ১৯, ২০০৬)-এর একটি রিপোর্টে দেখলাম বিজ্ঞানীরা মাটির ২.৮ কিলোমিটার গভীরে সোনার খনিতে একধরনের 'চরম জীবী' অণুজীব খুঁজে পেয়েছেন যারা সূর্যের আলোর বদলে ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তাকে শক্তির আধার হিসেবে ব্যবহার করে।

তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত চরমজীবী হচ্ছে *নল কৃমি* (Tube worm)। সমুদ্র তলদেশের গভীর ফাটলে বসবাস এদের। পানির ভয়াবহ চাপ, গভীর অন্ধকার, ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়েও বেশি তাপমাত্রা এবং ফাটল থেকে নির্গত ভয়ংকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিকে উপেক্ষা করেও এরা টিকে আছে। টিউব ওয়ার্মের ভিতরে একধরনের ব্যাক্টেরিয়া থাকে যাদের নাম Pyrolobus fumarii. এরা এই তাপমাত্রায় এমনভাবে অভ্যস্ত যে তাপমাত্রা কিছুটা কমে একশ পচানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছুলেই তারা তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়, এমন একটা ভাব যেন তারা 'ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে'!

প্রাণের এই ব্যাপক বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও জীববিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সকল প্রজাতির প্রাণকে তিনটি এলাকায় (domain) ভাগ করেছেন । সমস্ত বৃহৎ ও জটিলকোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদ নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতকোষী (Eukarya)। যে সকল এককোষী প্রাণ যাদের কোষে কোন নিউক্লিয়াস নেই তাদেরকে নিয়ে ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং নিউক্লিয়াসবিহীন আদিম প্রাণ যাদের কোষের প্রাচীর ব্যাক্টেরিয়ার থেকে ভিন্ন তাদের সমন্বয়ে আদিকোষী (Archaea)। প্রতিটি ভাগের প্রজাতিসমূহ একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তিনটি এলাকাই আবার একই উৎস থেকে এসেছে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী এক ধরনের চরমজীবী *Methanopyrus*-এর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্র-প্র পিতামহ হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই রয়েছে। এর অর্থ একেবারেই পরিস্কার। প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে পৃথিবীর সকল জীবই একে অন্যের আত্মীয়!

## প্রাণের প্রকৃতি

আমরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীতে কিংবা ইটির মত চলচিত্রে কিম্ভুতকিমাকার মহাজাগতিক প্রাণীদের বর্ণনা পাই যারা আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীটা আক্রমণ করার জন্য

মুখিয়ে আছে। তাদের থাকে সবুজ চামড়া, বিশাল বিশাল চোখ আর বড় বড় অ্যান্টেনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক কিংবা চিত্রশিল্পীরা একেবারেই কল্পণার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন। এমন মনে করার আসলে কোনোই কারণ নেই অন্য কোন গ্রহের প্রাণ দেখতে হবে অনেকটা সরীসৃপ অথবা একটা কীটপতংগ অথবা মানুষের মতো; কিংবা তাদের 'কসমেটিক এডজাস্টমেন্ট' দিসেবে থাকবে সবুজ চামড়া, বিন্দুবৎ কান এবং এন্টেনা! বহির্জাগতিক প্রাণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কার্ল স্যাগান সঙ্গত কারণেই তাই বলতেন, 'আমি কল্পবিজ্ঞানের ঐ ধরণের বহির্জাগতিক প্রাণীগুলোর আকার আকৃতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বেশিরভাগ গুলোর সাথেই একমত নই।'

পৃথিবীতে প্রাণের সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং অনন্যসাধারণ উপাদান হচ্ছে ডিএনএ অণু। কয়েক হাজার পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি ডিএনএ অণু। এই অণুর এক একটি অবিশ্বাস্যভাবে বিপুল সংখ্যক তথ্য বহন করে থাকে। ডিএনএ-র বৈচিত্রের কারণেই পৃথিবীতে উদ্ভব হয়েছে নানাবিধ প্রজাতির।

প্রশ্ন হচ্ছে, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও ডিএনএ-র অস্তিত্ব আছে কিনা। ডিএনএ অণু যেহেতু কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং আরো কিছু পরমাণু দিয়ে গঠিত, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও ডিএনএর অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজন, নাইট্রোজেন বা ফসফরাসময় পরিবেশ মহাবিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। তবে এটাও সত্যি যে, ডিএনএ-র জটিল কাঠামো যা একে তথ্য বহনকারী হিসাবে তৈরি করেছে তা কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে সেটা বলা খুবই কঠিন। কাঁচামাল সহজলভ্য হলেও ডিএনএ-র উদ্ভব আচমকা এবং সৌভাগ্যপ্রসুত বিষয় বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে অনেকদিন ধরে।

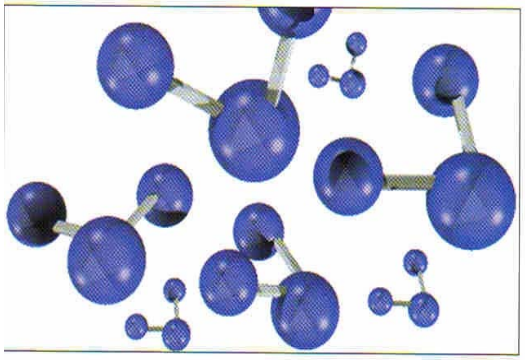
অবশ্য আরো একটি ভিন্ন ধরনের সম্ভাবনাও আছে। মহাবিশ্বের অন্য কোথাও হয়তো ভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তিতে ভিন্নভাবে বিকাশ ঘটেছে প্রাণের। প্রাণ বলতে যদি এমন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয় যার ভৌত ভিত্তি নির্ভর করে শক্তি সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে কাজে লাগানো তাহলে এমনকি 'অরাসায়নিক প্রাণের'ও সম্ভাবনা থাকতে পারে। এমনকি তা হতে পারে আয়োনাইজড্ গ্যাস কিংবা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করেও। আমাদের পার্থিব প্রাণের ভৌত ভিত্তি হল কার্বন পরমাণুর রসায়ন। এই কার্বন পরমাণু অসংখ্য বন্ধন তৈরি করছে দুটো কারণে: আইসোমারিজম এবং ক্যাটিনেশন; ফলে গঠিত হতে পারে লম্বা, জটিল ও স্থায়ী শৃঙ্খল। কার্বনের পরিবর্তে অনেক বিজ্ঞানীই মহাজাগতিক প্রাণের ভিত্তি হিসাবে সিলিকনকে কল্পনা করেছেন। কার্বনের মতো সিলিকনও চারটি রাসায়নিক বন্ধন গঠন করতে পারে। যার অর্থ দাড়াচ্ছে, প্রাণের ক্ষেত্রে যেমন জড়িত

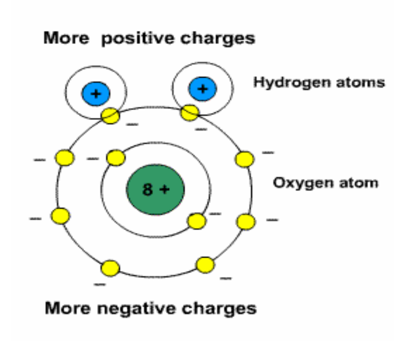
রয়েছে কার্বনভিত্তিক অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া, ঠিক তেমনই একইভাবে কার্বনের মতো সিলিকনভিত্তিকও অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, পৃথিবীতে কার্বনের তুলনায় সিলিকন ১৩৫ গুণ বেশী পরিমানে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এখানে সিলিকনভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেনি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, সিলিকনের বন্ধন কার্বনের মত এতটা শক্তিশালী নয়, এবং ডবল বন্ধনও অতোটা সহজে তৈরি হয় না। সিলিকন পরমাণুর আকার কার্বন পরমাণুর চেয়ে বড়। বৃহৎ এই আকৃতির কারণে সিলিকন কার্বনের মতো হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে না। যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন বন্ধনকে ব্যবহার করে থাকে সেগুলো সাধারণত কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী ও নমনীয় হয়ে থাকে। সমস্ত বিষয়ের বিবেচনায় অনেকের কাছেই কার্বন জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হিসাবে বিবেচিত। এর ফলাফল হচ্ছে, আমাদের জীববিজ্ঞানীদের যাবতীয় গবেষণা অস্বস্তিকরভাবে ওই একই ধরনের ‘কার্বন ভিত্তিক’ জীববিজ্ঞানের কারাগারে বন্দি।

## সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান

পৃথিবীর বাইরে এই সৌরজগতে আর যে দু’টো জায়গায় প্রাণ থাকার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার একটি হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ এবং অন্যটি বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা। বর্তমানে মঙ্গলের যে পরিবেশ তাতে করে সেখানে প্রাণ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। প্রতিদিনের গড় তাপমাত্রা ২২০ কেলভিনের উপর সচরাচরই উঠে যেটা পানির জমাটাংকের চেয়েও ৫৩ কেলভিন নীচে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রচুর তথ্য প্রমান রয়েছে যা থেকে ধারণা করা হয় যে মঙ্গলে একসময় তরল পানির অস্তিত্ব ছিল এবং বর্তমানেও সম্ভবত এর ভূ-গর্ভে পানি রয়ে গেছে।

পানির আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের কাছে সবসময়ই আকর্ষণীয়, কেননা পৃথিবীতে খুব সম্ভবত প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে পানিতে এবং প্রাণের টিকে থাকার জন্য পানির কোন বিকল্প নেই। পানি এমন একটি তাপমাত্রার সীমায় তরল অবস্থায় থাকে যেখানে প্রাণের অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে। দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত হয় পানির অণু। যেহেতু হাইড্রোজেন পরমাণু দু’টি অক্সিজেন পরমাণুর পুরোপুরি বিপরিত দিকে অবস্থান করে না, সে কারণে পানি মেরু অণু (Polar molecule) হিসাবে বিবেচিত অর্থাৎ এটি ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে সামান্য প্রভাবিত হয়। এ ছাড়া জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানগুলোর প্রায় সবই পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে। পানি ছাড়া অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াই সম্ভব নয়।






**চিত্র ৬.১ :** পানির অণুর রাসায়নিক গঠন

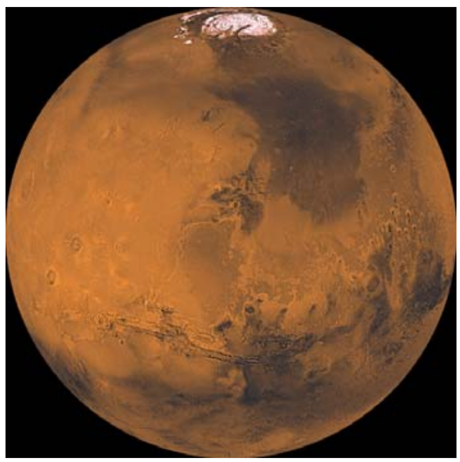
এছাড়া পানির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এটি এর হিমাঙ্কের সামান্য উপরে কিছুটা প্রসারিত হয় অর্থাৎ পানি সবচেয়ে ভারি এবং এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি চল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ফলে বরফ যেহেতু পানির তুলনায় হালকা কাজেই অনায়াসে ভেসে থাকে পানির উপর। শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোন হ্রদের পানি যখন ক্রমান্বয়ে শীতল হতে শুরু করে তখন উপরের পানির ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং সেগুলো নীচের দিকে চলে যেতে থাকে। ফলে শুধুমাত্র উপরিভাগের পানিই বরফে পরিনত হয় এবং সেখানেই থেকে যায়। বরফ যদি লেকের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হতো তবে সেখানে কোন জলজ প্রাণীরই বেঁচে থাকা সম্ভবপর হতো না।

জোতির্বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে জীবনের সহায়ক হিসাবে পানির বিকল্পের কথাও চিন্তা করেছেন। তবে সেই সম্ভাবনার পরিমানও খুবই কম। মাত্র তিনটি অণু আছে যাদের পানির যে সমস্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তার কিছু কিছু আছে। এরা হচ্ছে মিথেন, এমোনিয়া এবং হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড। এরা প্রত্যেকেই একটি বেশ বড় ধরনের তাপমাত্রার সীমায় তরল অবস্থায় থাকে। মহাবিশ্বে এদের পরিমাণও প্রচুর বা বলা যেতে পারে যে সমস্ত পরমাণু প্রয়োজন এগুলো তৈরি করার জন্য তা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান। তবে এটা ঠিক যে পানির অণু গঠনের উপাদান হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের মতো এতো ব্যাপক পরিমাণে নেই। প্রত্যেকেই পানির মতো না হলেও মোটামুটি বেশ ব্যাপক পরিমাণ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে দ্রভীভূত করতে পারে।

মঙ্গলের ওডিসি মিশনের (Odyssey) Thermal Emission Imaging System (THEMIS) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ছবি থেকে দেখা গেছে যে মঙ্গলের উপত্যকায় অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সম্বলিত নালা রয়েছে। এই ধরনের নালা পৃথিবীতে গঠিত হয়েছে শুধুমাত্র পানি প্রবাহের জন্য। মঙ্গলের পানি হয়তো বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এসেছে বা ভূ-গর্ভস্থ সঞ্চয় থেকেও আসতে পারে। যেখান থেকেই আসুক না কেন এই সমস্ত নালা গঠনের পেছনে পানি যে ভূমিকা

রেখেছে সেটা নিশ্চিত। উপত্যকার নালাসমূহের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা প্রমাণ করে যে এগুলো ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ একসময় মঙ্গলের পৃষ্ঠে পানির প্রবাহ ছিল।

যদিও মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের ইতিহাস অজানা, তারপরও ধারণা করা হয় যে, সাড়ে তিন বিলিয়ন থেকে চার বিলিয়ন বছর আগে বায়ুমন্ডল হয়তো আরো ঘন ছিল। ফলে শক্তিশালী গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে মঙ্গল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ ছিল সেই সময়। ফলে মঙ্গলের পৃষ্ঠে পানি তরল আকারে থাকতে পেরেছে। সাড়ে তিন বিলিয়ন বছর আগে মঙ্গলের ভূ-গর্ভে অনেক বেশি পরিমানে পানি সঞ্চিত ছিল। মাঝে মাঝেই সেখান থেকে বন্যার আকারে পানি বের হয়ে এসেছে ভূ-পৃষ্ঠে, তৈরি করেছে জল নিষ্কাষণের অসংখ্য নালা। এই তথ্যের ভিত্তিতে এখনো মঙ্গলের পৃষ্ঠের কয়েক কিলোমিটার নিচে যেখানে তাপমাত্রা বরফের গলনাংকের চেয়ে বেশি সেখানে পানি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।



**চিত্র ৬.২ :** মঙ্গল গ্রহ।

মঙ্গল সবসময়ই শক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর। আগ্নেয়গিরিগুলো সেই আদিম সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উষ্ণতা যুগিয়ে চলেছে। এ ছাড়া জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শক্তি আসতে পারে আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখন্ড থেকে। ব্যাসাল্টের মধ্যে লোহার অক্সিডাইজেশন যে শক্তি নির্গত করে তাও প্রাণীরা ব্যবহার করতে পারে। জৈবিক পদার্থে অফুরন্ত উপস্থিতি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আর যা যা দরকার তার ঘাটতি পূরণ করেছে। পানি এবং শক্তির উপস্থিতি থাকার কারণে মঙ্গলে হয়তো আলাদাভাবেই জীবনের উদ্ভব ঘটেছিল।

দু'টো ভাইকিং রোবট স্পেসক্রাফট **১৯৭৬** সালে মঙ্গলের বুকে নেমেছিল। এদের ভিতরে ছিল ক্ষুদ্রাকার স্বয়ংক্রিয় রাসায়নিক এবং জীব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। এই রোবট স্পেসক্রাফট মঙ্গলের মাটির নমুনা সংগ্রহ করে এবং তাতে কোন ধরণের বিপাক ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে কিনা দেখার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে বিপাক কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভাইকিং এক্সপেরিমেন্ট মঙ্গলের মাটিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে এই কার্বন ডাই অক্সাইড বিপাকের ফল নয় বরং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত মঙ্গলের ওই মাটি ভিন্ন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করেছে। এর অর্থ হচ্ছে খুব সম্ভবত মঙ্গলের মাটিতে বর্তমানে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

দূর অতিতে কি মঙ্গলের বুকে প্রাণ ছিল? এর উত্তর নির্ভর করছে কত দ্রুত জীবন উৎপন্ন হতে পারে তার উপর। জোতির্বিদরা মোটামুটি নিশ্চিত যে প্লানেটেসিমাল (planetesimals) এর পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে পৃথিবীর আদি অবস্থা প্রাণের জন্য পুরোপুরি বিরূপ ছিল। সেই সময় আমাদের এই ধরিত্রী ম্যাগমা বা গলিত পাথরের আচ্ছাদন দিয়ে আবৃত ছিল। ম্যাগমা শীতল হওয়ার পর যদি কোন প্রাণ থেকেও থাকে তবে সেগুলো মাঝে মাঝে বিশালাকৃতির যে সমস্ত প্লানেটেসিমাল তখনও পৃথিবীতে আঘাত হানতো তাদের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

চার বিলিয়ন বছর আগে এই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় স্থিতি আসে। প্রাপ্ত ফসিল থেকে দেখা যায় যে, ৩৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে অণুজীব ছিল। প্রাথমিক ধরনের এই সরল প্রাণগুলো প্রাণ-রসায়নগতভাবে বেশ কার্যকর ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল সালোক সংশ্লেষী, ফলে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে এগুলো। ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ কেমিস্ট্রির (Max Planck Institute of Chemistry) ম্যানফ্রেড শিডলোস্কি (Manfred Schidlowski) আদিম পাথরের কার্বন আইসোটোপের অনুপাত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ৩৮০ কোটি বছর আগেও পৃথিবীতে প্রাণের সমাহার ছিল। পৃথিবীতে প্রাণ বিকাশের এই দ্রুততা দেখে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রয়াত) খ্যাতনামা জ্যোতির্পদার্থবিদ কার্ল স্যাগান (Carl Sagan) যুক্তি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ অনেকটা অবশ্যম্ভাবী ছিল; অর্থাৎ, পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেলে প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তন একটি মহাজগতিক অবশ্যম্ভাবিতা (Cosmic Inevitability)। একই ধরণের মত প্রকাশ করেন নোবেল বিজয়ী প্রাণরসায়নবিদ খ্রীষ্টান দ্য দুভে (Christian de Duve)ও। তিনি অনেকটা নিঃসংশয় হয়েই বলেন : ' জীবনের উৎপত্তি অবশ্যাম্ভাবী ... যেখানেই প্রাণ

সহায়ক পরিবেশ পাওয়া যাবে, যা আমাদের পৃথিবীতে প্রায় চারশ কোটি বছর আগে ছিল, সেখানেই প্রাণের বিকাশ ঘটবে' (Crawford, 2002)।

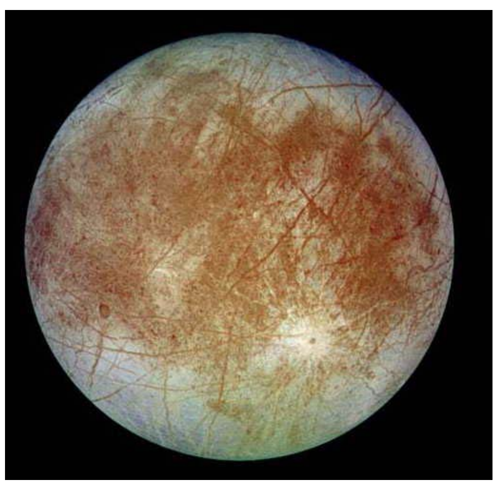
চারশ কোটি থেকে তিনশ আশি কোটি বছর আগে মঙ্গলের পরিবেশও পৃথিবীর মতোই প্রাণ উদ্ভবের সহায়ক ছিল। মঙ্গলের পৃষ্ঠে প্রাচীন নদী, লেক এমনকি ১০০ মিটার গভীরতার সাগরেরও চিহ্ন রয়ে গেছে। চারশ কোটি বছর আগে মঙ্গল এখনকার তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ এবং সিক্ত ছিল। এই সমস্ত তথ্য ধারণা দেয় যে, প্রাচীন পৃথিবীর মতো প্রাচীন মঙ্গলেও প্রাণের বিকাশ ঘটে থাকা সম্ভব। যদি তাই হয়ে থাকে তবে মঙ্গল বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থা থেকে বন্ধুর পরিবেশের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে প্রাণও হয়তো সর্বশেষ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছে মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ তাপের ফলে স্থায়ী বরফের নিচের বিগলিত লবণাক্ত হ্রদে বা সিক্ত স্থানগুলোতে। বেশিরভাগ প্লানেটারি বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ভবিষ্যত মঙ্গল অভিযানে আদিম প্রাণের রাসায়নিক বা অঙ্গসংস্থানিক জীবাশ্ম খুঁজে বের করা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

বর্তমানে এটা পরিষ্কার যে, সৌরজগত এবং এর বাইরে সর্বত্রই জৈব রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব বিদ্যমান। মঙ্গলের ছোট্ট উপগ্রহ ফোবোস (Fobos) এবং ডেইমোস (Deimos)-এর গাঢ় রং দেখে ধারণা করা হয় যে, এই দু'টি উপগ্রহ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি বা নিদেনপক্ষে জৈব পদার্থের আস্তরণ দিয়ে আচ্ছাদিত। অনেকেরই ধারণা যে এরা সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তের গ্রহাণু (Asteroid) যা আটকে পড়েছে মঙ্গলের কক্ষে। জৈব পদার্থ দিয়ে আচ্ছাদিত এই রকম ছোট ছোট গ্রহাণু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সৌরজগতের বিভিন্ন জায়গায়। বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের মধ্যবর্তী প্রধান গ্রহাণুপুঞ্জ বেল্টের (Asteroids Belt) C এবং D ধরনের গ্রহাণুগুলি, ধুমকেতুর কেন্দ্র যেমন হ্যালির ধুমকেতু এবং সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তের একগুচ্ছ গ্রহাণুও রয়েছে। ১৯৮৬ সালে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির নভোযান Gitto হ্যালির ধুমকেতুর চারপাশের ধূলির মেঘের মধ্য দিয়ে সরাসরি উড়ে যায়। Giotto-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হ্যালির ধুমকেতুর কেন্দ্র ২৫ শতাংশ জৈব পদার্থ দিয়ে তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবীতে প্রাপ্ত বহুল পরিমানে Carbonaceous chondrite উল্কাপিন্ডগুলো প্রধান গ্রহাণুপুঞ্জ বেলটের C ধরনের গ্রহাণুদের অংশ বলে মনে করা হয়। Carbonaceous উল্কাপিন্ডগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমানে এরোম্যাটিক এবং অন্যান্য হাইড্রোকার্বন পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক এমিনো এসিড এবং নিউক্লিওটাইড বেসও খুঁজে পেয়েছেন।

ধারণা করা হয় যে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে আঘাত করা উল্কাপিন্ড এবং ধুমকেতুগুলো হয়তো প্রাচীন সময়ে প্রচুর পরিমানে জৈব অণু বহন করে নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে। এদের মধ্যে কোন কোনটি হয়তো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশের সময় প্রচন্ড তাপকে উপেক্ষা করে অক্ষত থেকে গিয়েছিল এবং ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। একই ধরনের ঘটনা অন্য গ্রহেও ঘটতে পারে। উল্কা এবং ধুমকেতু পানিসহ অন্যান্য জৈবিক পদার্থ বয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই সব গ্রহে। ওই গ্রহগুলোতে পৃথিবীর মতো প্রাণ-পূর্ব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার জন্য যে বিপুল পরিমানে পানি থাকতে হবে তা কিন্তু নয়। ছোট্ট একটু পানির পুকুর, বরফের আস্তরণের নিচের সামান্য কিছু পানিই কিন্তু প্রাণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট।

উপগ্রহ ট্রাইটন, ক্যালিস্টো এবং টাইটানের আকার এবং রাসায়নিক গঠন এদেরকে প্রাণ সহায়ক উপগ্রহ হিসাবে বিজ্ঞানীদের কাছে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু যে উপগ্রহটি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে বৃহস্পতির তৃতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ ইউরোপা। মনুষ্যবিহীন রোবট স্পেসক্রাফট ইউরোপা এবং সৌরজগতের দূরবর্তী প্রান্তের প্রায় মোটামুটি সব উপগ্রহগুলিরই ছবি তুলেছে। পৃথিবীতে প্রেরিত এই সব ছবিতে উপগ্রহগুলোর অনেক খুঁটিনাটি প্রকাশ পেয়েছে। এই ছবিগুলো থেকে দেখা যায় যে প্রতিটি উপগ্রহেরই আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।



**চিত্র ৬.৩ :** ইউরোপা

ইউরোপার প্রথম ঝাপসা ছবি পাঠায় ভয়েজার মহাকাশযান ১৯৭৯ সালে। পরবর্তীতে গ্যালিলিও মিশন আরো নিখুঁত ছবি পাঠিয়েছে ইউরোপার। সাদা চাদরে মোড়া এই উপগ্রহের ছবিতে দেখা যায় যে অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা এর সারা গা বেয়ে বিস্তৃত। ইউরোপার সাদা চাদর হচ্ছে বরফ, আর কিছু নয় । ইউরোপা প্রায় এক মাইল চওড়া বরফে আচ্ছাদিত। আঁকাবাঁকা রেখাগুলো হচ্ছে বিশালাকার হিমবাহগুলোর প্রান্তদেশের মিলন মেলায় উৎপন্ন

সুদীর্ঘ দেয়াল (Ridge)। হিমবাহগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে তৈরি করেছে বিশালাকার বরফের চুঁড়া।

২০০০ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার জোতির্বিদ মার্গারেট কিভেলসন (Margaret Kivelson) ঘোষণা করেন যে, মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান গ্যালিলিওর ম্যাগনেটিক সেন্সর বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপায় বরফের আস্তরণের নীচে জলীয় সাগরের প্রমাণ পেয়েছে। জলের এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীদেরকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে তোলে। কেননা পৃথিবীতে খুব সম্ভবত প্রাণের প্রথম উদ্ভব হয়েছে পানিতে এবং পানি ছাড়া প্রাণ টিকে থাকতে পারে না। যদিও প্রাণ আশ্চর্যজনকভাবে যে কোন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তবুও পানি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা খুবই কঠিন।

বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণের সামান্য হেরফেরই ইউরোপার উষ্ণতার মূল উৎস। ইউরোপার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত তাপ আছে যা পানিকে তরল অবস্থায় রাখতে সক্ষম। পৃথিবীর সাগরের তলদেশের মতই ইউরোপার জলীয় সাগরের নিচেও উষ্ণ খাদ থাকতে পারে।

সৌরজগতের আটটির মধ্যে সাতটি গ্রহেরই ঘন বায়ুমন্ডল রয়েছে। এই গ্যাসীয়মন্ডলও জীবনের অস্তিত্বের জন্য খুব ভাল জায়গা হতে পারে। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রাসায়নিক উপাদানই যেমন কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন গ্যাসীয়মন্ডলের অণুগুলোতে বিদ্যমান। পানির বাষ্প এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তরলগুলোও সেখানে প্রচুর পরিমানে রয়েছে। সূর্যের আলো উপর থেকে শক্তি জোগাতে পারে এবং সামান্য কিছু পরিমান তাপ আসতে পারে গ্রহগুলোর গলিত লাভা থেকে। বাতাসে চলাচলের মুক্ত স্বাধীনতা এবং ভেসে থাকার সামর্থের কারণে এই পরিবেশের প্রাণীদের শক্ত কাঠামোরও প্রয়োজন নেই।

সূর্যের আলোকে ভেনাসের বায়ুমন্ডল ভেদ করে যেতে দেয়। ফলে উপগ্রহের পৃষ্ঠদেশ এবং বায়ুমন্ডলের নিচের অংশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। গ্রীন হাউজ এফেক্টের কারণে পরবর্তীতে বায়ুমন্ডল সমপরিমান তাপকে মহাশূন্যে চলে যেতে বাধা দেয়। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার কারণে ভেনাস মোটামুটি নরকের মতো উত্তপ্ত হয়ে আছে। এর পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা প্রায় ৪৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা সীসাকেও গলিয়ে ফেলতে সক্ষম। বায়ুর চাপও ভয়ঙ্কর রকমের বেশি সেখানে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তুলনায় প্রায় নব্বই গুন বেশি। প্রচন্ড তাপমাত্রার

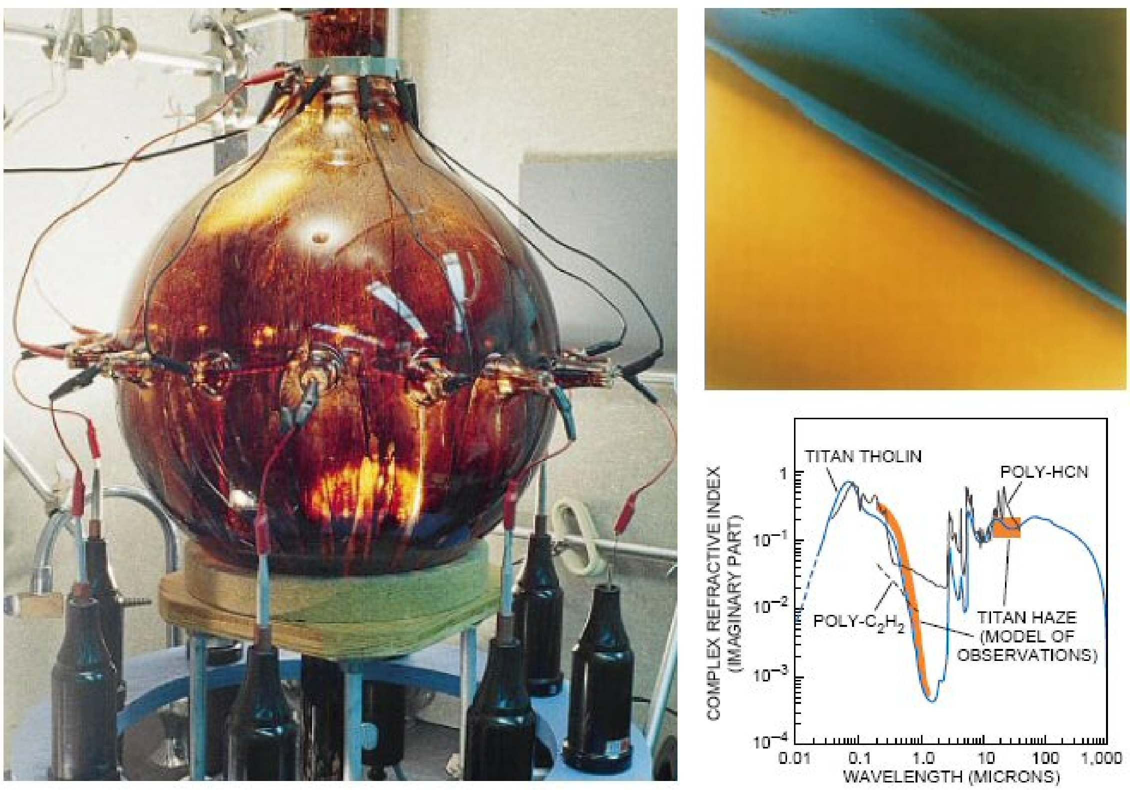
কারণে সেখানে বায়ু প্রবাহিত হয় ২৪০ মাইলের বেশি গতিতে। তীব্র উষ্ণতার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি কোন বাতাসও নেই বলতে গেলে।

কিন্তু ভেনাসের বায়ুমন্ডলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তিরিশ মাইল উপরে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এখানকার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। এর অবস্থান বায়ুমন্ডলের মাঝামাঝি পর্যায়ে। এই অবস্থাকে বলা হয় Goldilock effect. ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের জোতির্বিদ ড্রিক শুলজ-মাকুচ (Drik Schulze-Makuch) বলেন যে ভেনাসের বায়ুমন্ডলে দৃশ্যমান তিনটি এসিডিক রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই অক্সাইড এবং কার্বনিল সালফাইড সেখানকার বাতাসে ভেসে থাকা অণুজীবের উপজাতও হতে পারে। পৃথিবীতে কিছু কিছু চরমজীবী যে পরিবেশে টিকে আছে এই পরিবেশ তার চেয়ে খুব একটা খারাপ কিছু নয়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলেও ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি রয়েছে যেগুলো ভেসে বেড়ায় এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে।

মঙ্গলের কক্ষপথের পর থেকে সূর্যের আলোর তীব্রতা কমে গেছে বেশ খানিকটা। এখান থেকেই বিশালাকৃতির গ্যাসীয় গ্রহগুলোর সুত্রপাত। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন এই চারটি গ্রহের কোনটিরই শক্ত ভূ-পৃষ্ঠ নেই। কিন্তু ভেনাসের মতোই এখানেও বায়ুমন্ডলের Goldilock effect এলাকায় জীবনের জন্য সহায়ক পরিবেশ রয়েছে। জোতির্বিজ্ঞানী ই ই স্যালপিটার (E.E. Salpeter) এবং কার্ল স্যাগান (Carl Sagan) প্রস্তাব দেন যে, পৃথিবীতে প্রথম বিলিয়ন বছরে যে প্রক্রিয়ায় প্রাণের বিকাশ হয়েছিল সেই একই রকমভাবে এই সমস্ত গ্যাসীয় দৈত্যাকার গ্রহের বায়ুমন্ডলেও প্রাণের বিকাশ ঘটে থাকতে পারে। ১৯৯৫ সালে গ্যালিলিও মহাকাশযান যখন বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলে ঢুকেছিল তখন সেখানে কোন প্রাণের অস্তিত্ব উদঘাটন করতে পারেনি। এর আগের বছর ধুমকেতু শুমেখার লেভি যখন বৃহস্পতির উপর আছড়ে পড়ে তখনও কোন জৈবিক বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু বৃহস্পতির বায়ুমন্ডল এতোই সুবিশাল যে এক জায়গায় না পাওয়া গেলেও অন্য কোথাও জীবনের উপস্থিতির সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৃহস্পতি অবশ্য আরো একটি কারণে বিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রে থেকে যাচ্ছে। বৃহস্পতির মতো একই ধরনের গ্রহ মহাকাশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। সেই সমস্ত গ্রহের বায়ুমন্ডলের রাসায়নিক গঠন বৃহস্পতির বায়ুমন্ডলের মতোই জটিল হওয়ার কথা। এই ধরনের গ্রহ যত বেশি মহাবিশ্বে আবিষ্কৃত হবে তত বেশি সেই সমস্ত গ্রহে জীবন বিকাশের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হবে।

শনির দৈত্যাকৃতির উপগ্রহ টাইটানের (এটা প্রায় বুধ গ্রহের সমান আয়তনের) প্রাণ-পূর্ব জৈব রসায়ন বিজ্ঞানীদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে এই উপগ্রহটির প্রতি। আমাদের চোখের সামনেই এখানে জটিল অণুর সংশ্লেষ ঘটে চলেছে প্রতিমুহূর্তে। প্রধানত নাইট্রোজেন অণু এবং সামান্য কিছু পরিমানে (১০ শতাংশ) মিথেন সমন্বয়ে গঠিত টাইটানের বায়ুমন্ডল পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তুলনায় প্রায় দশগুণ বড়। ১৯৮১ সালে ভয়েজার-২ টাইটানের কাছাকাছি যাওয়া সত্ত্বেও এর চারপাশের লালচে গোলাপী অস্বচ্ছ কুয়াশার কারণে এর ভূ-পৃষ্ঠের হদিস পায়নি। টাইটানের ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা খুবই কম, মাত্র ৯৪ কেলভিন বা মাইনাস ১৭৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। টাইটানের স্বল্প ঘনত্ব এবং এর আশেপাশের গ্রহ উপগ্রহের সাথে তুলনা করে অনুমান করা যায় যে, এর ভূ-পৃষ্ঠ বা তার কাছাকাছি কোথাও বিপুল পরিমাণে বরফ রয়েছে। সেই সাথে সামান্য কিছু সংখ্যক সরল অণু যেমন হাইড্রোকার্বন এবং nitriles ও পাওয়া গেছে টাইটানের বায়ুমন্ডলে। সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি, শনির চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে আটকে পড়া আয়নিত অণু এবং কসমিক রশ্মি সব একসাথে টাইটানের বায়ুমন্ডলে ঝাপিয়ে পড়ে সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছে।




**চিত্র ৬.৪ :** টাইটানের নাইট্রোজেন-মিথেন বায়ুমন্ডলের ল্যাবরেটরী সিমুলেশন

কার্ল স্যাগান এবং তার সহকর্মী বিষুন এন খারে (Bishun N. Khare) গবেষণাগারে কৃত্রিম ফ্লাস্কের মধ্যে টাইটানের বায়ুমন্ডল এবং এর চাপকে সিম্যুলেট করেন এবং এর মধ্য দিয়ে

বিদ্যুৎ ক্ষরণ ঘটান। এর ফলশ্রুতিতে গাঢ় বর্ণের ঘন কাদার মতো জৈবিক পদার্থ তৈরি হয়। তারা এর নামকরণ করেন টাইটান থোলিন (Titan Tholin)। এই টাইটান থোলিনের অপটিক্যাল কনস্ট্যান্ট পরিমাপ করে বিজ্ঞানীদ্বয় দেখেন যে এটা টাইটানের বায়ুমন্ডলের অপটিক্যাল কনস্ট্যান্টের সাথে হুবহু মিলে যায়।

টাইটানের বায়ুমন্ডলের উচ্চস্তরে প্রতি মুহূর্তেই তৈরি হচ্ছে জৈব অণু এবং তা ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে নতুন থোলিন তৈরি হওয়ার সাথে সাথে। গত চার মিলিয়ন বছর ধরে যদি এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে তবে টাইটানের পৃষ্ঠ কয়েকশ' মিটার থোলিন এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ দিয়ে আবৃত হয়ে যাওয়ার কথা। স্যাগান এবং খেয়ার তাদের ল্যাবে তৈরি টাইটানের থোলিনের সাথে পানি মেশানোর ফলে এমিনো এসিডও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু এমিনো এসিডই নয়, এর মধ্যে ছিল নিউক্লিওটাইড বেজ, পলিসাইক্লিক এরোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন এবং আরো কিছু জৈব পদার্থের সমাহার।

অতি সম্প্রতি নাসার মহাকাশযান ক্যাসিনির (Cassini) পাঠানো রাডার ইমেজ টাইটানের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশ জানাডুতে (Xanadu) পৃথিবীর মতো ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছে। এই রাডার ইমেজ থেকে দেখা যাচ্ছে যে জানাডুর পশ্চিম প্রান্তে গাঢ় বর্ণের বালিয়াড়ীর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য শাখা প্রশাখা সম্বলিত নদী, পাহাড় এবং উপত্যকা। এই নদীগুলো আরো কৃষ্ণ এলাকার দিকে চলে গেছে যাকে মনে করা হচ্ছে লেক বলে। এই ইমেজ থেকে গ্রহাণু আঘাত বা আগ্নেয়গিরির কারণে একটি জ্বালামুখও (Crater) দৃশ্যমান।

ক্যাসিনি ইন্টারপ্লানেটারি বিজ্ঞানী ডঃ জোনাথান লুনাইন (Dr. Jonathan Lunine) বলেন যে, 'টাইটান পৃথিবী থেকে এতো দূরে যে পৃথিবীতে বা মহাকাশে অবস্থিত টেলিস্কোপের মাধ্যমে এর সব কিছু দৃশ্যমান ছিল না। ফলে আমাদেরকে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সব কিছুই অনুমান করে নিতে হয়েছে। কিন্তু এখন ক্যাসিনির শক্তিশালী রাডার চোখের কারণে আর আমাদেরকে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। আশ্চর্যজনক যে, পৃথিবী থেকে বহু দূরের এই উপগ্রহে পৃথিবীর মতোই ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।'

১৯৮৪ সালে নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপ প্রথম টাইটানের জানাডু এলাকা আবিষ্কার করে। এ বছরের (২০০৬) এপ্রিল মাসে যখন ক্যাসিনির রাডার সিস্টেম জানাডুকে পর্যবেক্ষণ করে তখনই দেখা যায় যে, এর ভূ-পৃষ্ঠ বায়ু, বৃষ্টি এবং তরল পদার্থের কারণে পরিবর্তিত হয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ক্যাসিনির বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রোব হাইজেন্স (Huygens) অবতরণ করে টাইটানের পৃষ্ঠের কাদামাটিতে। পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে টাইটানে জলীয় পদার্থ রয়েছে। টাইটানের আবিষ্কারক ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইজেন্স (Christian Huygens) আজ বেঁচে থাকলে টাইটানে জলীয় পদার্থের উপস্থিতির ঘটনায় হয়তো খুব একটা অবাক হতেন না। হাইজেন ১৬৫৫ সালে টাইটান আবিষ্কার করেন। তার সম্মানার্থেই ক্যাসিনির প্রোবের নামকরণ করা হয়েছে হাইজেন্স। এখন থেকে তিনশ' বছরেরও বেশি সময় আগে ১৬৯৮ সালে হাইজেন্স টাইটানে পানি থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে লিখেছিলেনঃ

> *"Since 'tis certain that Earth and Jupiter have their Water and Clouds, there is no reason why the other Planets should be without them. I can't say that they are exactly of the same nature with our Water; but that they should be liquid their use requires, as their beauty does that they be clear. This Water of ours, in Jupiter or Saturn, would be frozen up instantly by reason of the vast distance of the Sun. Every Planet therefore must have its own Waters of such a temper not liable to Frost."*

তবে টাইটানে জলীয় পদার্থ পাওয়া গেলেও এটি সম্ভবত পানি নয়। মোটামুটি নিশ্চিত যে জলীয় এই পদার্থ হয় মিথেন না হয় ইথেন। হয়তো এই তরলই বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে জানাডুতে কিংবা ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে নির্গত হয় তরল পদার্থ। মিথেনের নদী ধূলিকণা বহন করে করেই তৈরি করেছে জানাডুতে ওইসব বালিয়াড়ী।

আমাদের সৌরজগতের বাইরে আন্তর্নক্ষত্রিক মহাশূন্যের গ্যাস এবং ধূলিকণার মধ্যেও জৈবিক পদার্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অণুদের ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে নির্গত এবং আত্মস্থ করা মাইক্রোওয়েভ বিশ্লেষণ করে জোতির্বিদরা চার ডজনেরও বেশি সরল ধরনের জৈবিক পদার্থ সনাক্ত করতে পেরেছেন। এদের মধ্যে কিছু কিছু জৈবিক পদার্থ যেমন হাইড্রোকার্বন, এমাইনস, এ্যালকোহল এবং নাইট্রাইলের $HC_{11}N$ এর মতো সোজা কার্বন শৃংখল রয়েছে।

অতি বেগুনি এবং মহাজাগতিক রশ্মিতে উন্মুক্ত আন্তর্নক্ষত্রিক ধূলিকণার জৈবিক পদার্থে প্রাণের উৎপত্তির আশা করাটা বোকামি। কেননা আমরা যে জীবনকে জানি তা গঠনের জন্য প্রয়োজন পানি আর পানি থাকার জন্য প্রয়োজন গ্রহ বা উপগ্রহ। জোতির্বিজ্ঞানীয় পর্যবেক্ষণ

দিন দিন এই ধারণার ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে যে এই মহাবিশ্বে গ্রহজগৎ বিরাজ করাটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। বিস্ময়করভাবে খুব কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত বেশ কিছু সংখ্যক নব্য গঠিত নক্ষত্রের চারপাশে যে গ্যাসীয় ও ধূলিকণার বৃত্ত রয়েছে তা গ্রহজগত উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান।

কার্নেগি ইনস্টিটিউটের জর্জ ডব্লিউ ওয়েদারিল (George W. Wetherill) একটি মডেল তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে ঐ সমস্ত গ্যাসীয় ধূলিকণা থেকে উৎপন্ন গ্রহদের বিন্যাস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা যায়। ইতোমধ্যে পেনসালভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির জেমস ক্যাস্টিং (James F. Casting) নক্ষত্র থেকে কত দুরত্বে থাকলে একটি গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠে তরল পানি থাকতে পারে তা হিসাব করে দেখিয়েছেন। এই দুই গবেষণাকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, সৌরজগতে নক্ষত্র থেকে একটি বা দু'টি গ্রহ কমপক্ষে এমন দুরত্বে থাকবে যেখানে তাদের পৃষ্ঠে পানি থাকা সম্ভবপর।

কার্ল স্যাগানের মতে আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর মতো পানিসমৃদ্ধ অসংখ্য গ্রহ রয়েছে যেখানে বিপুল পরিমাণে জটিল জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান। সূর্যের মতো নক্ষত্রকে পরিভ্রমণরত ওই সমস্ত গ্রহগুলোতে এমন পরিবেশ রয়েছে যেখানে বিলিয়ন বছরে প্রাণের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।

*অক্টোবর ৯, ২০০৬*

---

{*ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তির খোঁজে

## (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে -৭)

ফরিদ আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

তবু ভালবাসি
চমকে বিনাশ মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান,
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শ্বাশ্বতের দীপশিখা
উচ্ছলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## প্যানস্পারমিয়া (Panspermia)

বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই অনেকদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছিলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ একান্তভাবেই পৃথিবীর নিজস্ব ঘটনা। প্রচলিত চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী, কয়েক বিলিয়ন বছর আগে রাসায়নিক বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে উদ্ভব হয়েছে আদিমতম জীবন্ত কোষের। প্রাণের উৎপত্তির এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অজৈবজনি (Abiogenesis) যা এ বইয়ের প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর বিকল্প একটি সম্ভাবনাও আছে তা হচ্ছে জীবন্ত কোষ না হলেও এদের পূর্বাবস্থা অর্থাৎ 'জীবনের বীজ' মহাবিশ্বের অন্য কোথাও থেকে আসতে পারে। গত কয়েক দশকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এই ধারণাকে বেশ খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতাও দিচ্ছে। অনেকেই এখন ধারণা পোষণ করেন যে পৃথিবীর জৈবমন্ডল মহাজাগতিক কোন বীজ থেকে উদ্ভূত হলেও হতে পারে।

বিজ্ঞানে না হলেও অন্ততঃ জনপ্রিয় ধারার কল্পবিজ্ঞানে অনেকদিন ধরেই এ ধরণের একটা ধারণা ঠাঁই করে নিয়েছিল যে, বহু আগে মহাজাগতিক কোন সভ্যতার মাধ্যমে আমাদের এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে। আমরা হয়তো পৃথিবী নামক ল্যাবরেটরীতে তাদের সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার ফসল । কিংবা বেখেয়ালে তাদের আবর্জনা আমাদের গ্রহে ছুড়ে ফেলার

ফলে এখানে বিকশিত হয়েছে জীবনের। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এধরনের রং বেরং-এর কল্পকাহিনীকে খুব একটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না। কিন্তু তারপরেও- অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্কেলে হলেও মহাকাশ থেকে অন্য একটি উপায়ে পৃথিবীতে প্রাণের বীজের আগমন ঘটার সম্ভাবনাকে অনেক বিজ্ঞানী গুরুত্ব দিয়েই বিবেচনা করেন।

মহাশূন্যের হিমশীতল পরিবেশে কিছু সাধারণ অণু দুর্বল রেডিও এনার্জি নির্গত করে চলেছে প্রতিনিয়ত। জোতির্বিজ্ঞানীরা রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে এধরনের অণুগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন অনেকদিন ধরেই। খুব বেশি দিন আগে নয়, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে, সামান্য কিছুসংখ্যক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত সরল ধরনের অণু ছাড়া অন্য কোন অণু মহাশূন্যে থাকা অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিস্ময়ের পরিসীমা রইলো যখন তারা মহাশূন্যে আবিষ্কার করলেন বিভিন্ন ধরনের অনেক জটিল অণু। যেহেতু জটিল অণুর অস্তিত্ব আছে, কাজেই মহাশূন্যের গ্যাসীয় ক্ষেত্রে জীবনের মৌলিক অণুসমুহ যেমন অ্যামিনো এ্যাসিড গঠিত হওয়া খুব অসম্ভব কিছু নয়। পৃথিবী পৃষ্ঠে ভূপতিত হওয়া অনেক উল্কাপিন্ডেও একই ধরনের জটিল অণু পাওয়া গেছে। মহাশূন্যে ধূলিকণাকে আশ্রয় করেও জটিল অণু থাকতে পারে এবং যদি সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অণু থাকে তবে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাও অসম্ভব নয়। যদিও মহাশূন্যের হিম ঠান্ডার কারণে এর জন্য প্রয়োজন হবে মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের।

প্রায় এক শতাব্দী আগে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী রসায়নবিদ আরহেনিয়াস (Svante Arrhenius) এবং সত্তুরের দশকে ফ্রেড হোয়েল (Fred Hoyle) এবং চন্দ্র বিক্রমাসিংহে (Chandra Wickramasinghe) মত দেন যে, জীবনের মৌলিক ধরণ খুব সম্ভবত উদ্ভব হয়েছে মহাশূন্যে। উল্কাপিন্ড বা ধুমকেতুতে সওয়ার হয়ে অতঃপর 'প্রাণ'এসে পৌঁছেছে পৃথিবীতে। পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির এই ধারণাকেই বলা হয় প্যানস্পারমিয়া (Panspermia)। নব্বই এর দশকে Hale-Bopp এবং Hyakutake ধুমকেতু পর্যবেক্ষণরত বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে এই ধুমকেতুদ্বয় থেকে নিঃসৃত বাষ্পের মধ্যে জটিল রাসায়নিক পদার্থ মিথেন এবং ইথেন সহ আরো অনেক আকর্ষণীয় অণু রয়েছে।

ম্যাক্স বার্নস্টেইন (Max Bernstein) এবং জ্যাসন ডর্কিন (Jason Dworkin) নব্বই এর দশকের শেষ দিকে বহির্বিশ্বে জীবনের উৎপত্তির এই সম্ভাবনা নিয়ে নাসার ক্যালিফোর্নিয়াস্থ অ্যাস্ট্রোবায়োলজী ল্যাবরেটরীতে কাজ শুরু করেন। বরফ এবং ন্যাপথালিনের সংমিশ্রণে তারা মহাশূন্যের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করেন এবং মহাশূন্যে রেডিও অ্যাস্ট্রোনোমারদের আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থ Polycyclic aramatic hydrocarbons (PAH) যোগ করেন এর সাথে। অতঃপর এর মধ্য দিয়ে ক্রমাগত চালনা করেন অতি বেগুনি রশ্মি। এর ফলে দেখা

গেল যে, কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুলো আংটি আকৃতির quinones অণুতে পরিণত হয়েছে যা জীবন্ত কোষে প্রাপ্ত অণুর হুবহু প্রতিরূপ। কাজেই মহাশূন্যের সুশীতল পরিবেশের মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ে এই অণুগুলো একত্রিত হয়ে অত্যন্ত প্রাথমিক ধরনের জীবন গড়ে তুলতে পারে।

জীবন্ত হোক বা না হোক উল্কাপিন্ড বা ধুমকেতুর মাধ্যমে পৃথিবিতে আগত রাসায়নিক পদার্থসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান বিজ্ঞানী ক্রিস্টোফার চাইবা (Christopher Chyba) বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীর সাগর মহাসাগরের সমস্ত জল এবং বায়ুমন্ডলের সব বাতাসই ধুমকেতু থেকে এসেছে। কারণ পৃথিবী শীতল হওয়ার আগে এতে কোন জল বা বাতাস কিছুই ছিল না ।

পঞ্চাশের দশকে রসায়নবিদ হ্যারলড উরে (Harold Urey) এবং তার ছাত্র স্ট্যানলি মিলার (Stanley Millar) শিকাগো বিশ্বাবিদ্যালয়ের গবেষণাগারে জীবনের উৎপত্তির জন্য কোন ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন সে বিষয়ে তাদের সুবিখ্যাত গবেষণা পরিচালনা করেন (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । প্রাণের উৎপত্তির আগে পৃথিবীর শৈশব অবস্থায় যে সমস্ত উপাদান বিদ্যমান ছিল তাদের একটি মিশ্রণ বায়ু নিরোধক ফ্লাস্কে তারা তৈরি করেন। তারপর এর মধ্য দিয়ে শত শত ঘন্টা ধরে ইলেক্ট্রিক চার্জ, স্পার্ক পরিচালনা করেন তারা। ফ্লাস্ক খোলার পর তারা দেখতে পান যে, রাসায়নিক বিক্রিয়া সরল ধরণের অণুগুলোকে জটিল ধরনের অণুতে যেমন এ্যামিনো এ্যাসিডে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। এই গবেষণার ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এই কারণে যে, এ্যামিনো এ্যাসিড প্রোটিন গঠনের উপাদান এবং প্রোটিনই মূলত পরবর্তীতে তৈরি করে ডিএনএ। মাত্র কয়েক সপ্তাহে গবেষণাগারেই যদি এই বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটতে পারে তবে প্রকৃতিতে লক্ষ কোটি বছরে কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

গত বিশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে আটকে পড়া গ্যাসের মিশ্রনকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, পৃথিবীতে প্রাপ্ত তিরিশটির বেশি উল্কাপিন্ড মঙ্গলের পৃষ্ঠ থেকে এসেছে। ইতোমধ্যে জীববিজ্ঞানীরা এমন কিছু জীবাণু আবিষ্কার করেছেন যে গুলো এই উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে থেকে মহাশূন্যে স্বল্প পাল্লার ভ্রমণে টিকে থাকতে সক্ষম (যদিও আপাতত কেউই দাবী করছে না যে, এই জীবাণুগুলো সত্যি সত্যিই গ্রহান্তরে ভ্রমণ করেছে)। কিন্তু জীবাণুগুলি এই ধারণার নীতিগত ভিত্তির প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছে। এটা অসম্ভব নয় যে, প্রাণ হয়তো উৎপত্তি হয়েছিল মঙ্গলে। তারপর তা স্থানান্তরিত হয়েছে পৃথিবীতে। অথবা এর বিপরীতটাও হতে পারে, পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়ে সেখান থেকে প্রাণ গেছে মঙ্গলে। এই বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য গবেষকরা বর্তমানে গভীরভাবে জৈবিক বস্তুসমূহকে এক

গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে স্থানান্তরের উপায় নিয়ে গবেষণা করছেন । এই প্রচেষ্টা হয়তো আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু অমূল্য প্রশ্ন যেমন, কোথায় এবং কেমন করে প্রাণের উৎপত্তি হলো কিংবা পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের জৈবিক কাঠামো ভিত্তিক প্রাণ সম্ভব কিনা অথবা এই মহাবিশ্বে প্রাণ কি অতি স্বাভাবিক ঘটনা কিনা- ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জোগাতে সাহায্য করবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে লুই পাস্তুর কর্তৃক স্বতঃজনন তত্ত্ব পরিত্যক্ত হবার পর দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের কাছে জড় বস্তু থেকে প্রাণের উৎপত্তি এমনই অবাস্তব ছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকেই ধারণা পোষণ করতেন যে রেডিমেড প্রাণ পৃথিবীর বাইরের অন্য কোথাও থেকে এসেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ধারণাটা জোরালো হলেও প্যানস্পারমিয়ার মূল প্রকল্পটি আসলে অনেক প্রাচীন। আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক আনাক্সাগোরাস (Anaxagorus) প্যানস্পারমিয়া (Panspermia) নামের একটি অনুকল্প (Hypothesis) প্রস্তাব করেন। এই অনুকল্প অনুযায়ী সমস্ত প্রাণী এবং সমস্ত জড়বস্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অতি ক্ষুদ্র বীজ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

প্যানস্পারমিয়ার আধুনিক রূপটি অবশ্য পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হলো তার চেয়ে কিভাবে জৈবিক বস্তুসমূহ তৈজস্ক্রিয়তা, শৈত্যের প্রভাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে 'সজীব অবস্থায়' এসে পৌঁছেছে তার সমাধান পেতে বেশি আগ্রহী। যেখানেই উৎপত্তি হোক না কেন প্রাণকে জড় বস্ত থেকেই উৎপত্তি হতে হয়েছে এটা নিঃসন্দেহ। এই অজৈবজনির (Abiogenesis) বাস্তবতা তো পঞ্চাশের দশকে ইউরে-মিলার তাঁদের বিখ্যাত পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেই দেখিয়েছেন। এই বাস্তবতার মঞ্চায়ন পৃথিবীতে হতে পারে, কিংবা হতে পারে দূরবর্তী কোন গ্রহে, কিংবা হয়ত মহাশূন্যে।

প্রাণ উৎপত্তির এই নবতর ধারণাই প্যানস্পারমিয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে। সৌরজগতের প্রাথমিক বিশৃঙ্খল অবস্থায় পৃথিবীতে এসে পড়েছে সরল জৈবিক বস্তু সম্বলিত অসংখ্য উল্কাপিন্ড। তরুণ সেই পৃথিবী এনজাইম্যাটিক ফাংশন সম্বলিত জটিল ধরনের জৈবিক বস্তুও যে পায়নি তারও নিশ্চয়তা নেই। এই জৈবিক পদার্থগুলো যদিও প্রাণহীন অবস্থায় ছিল, কিন্তু জীবনের দিকে অনেকখানি অগ্রসর অবস্থায় যে ছিল তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর প্রাণ সহায়ক পরিবেশে এসে পড়ার পর এই অণুগুলো জীবন্ত কোষে পরিণত হওয়ার বিবর্তনের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। অবশ্য মধ্যবর্তী একটি অবস্থাও সম্ভব। প্রাণ হয়তো পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব দু'জায়গাতেই উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রাণ উৎপত্তির কোন পর্যায় কোথায় হয়েছে এবং উৎপত্তির পর প্রাণ কতদূর বিস্তৃত হয়েছে?

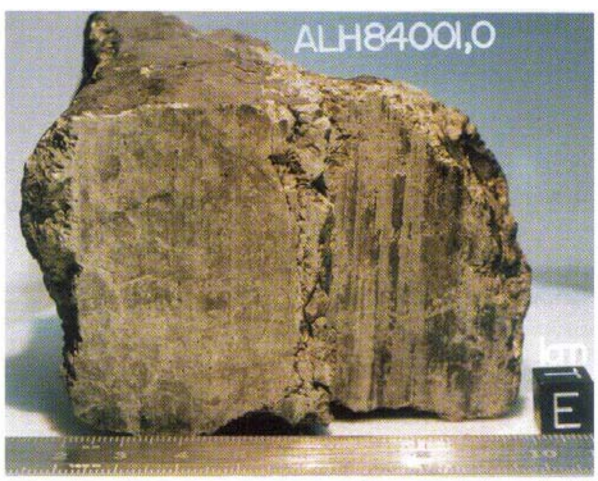
প্যানস্পারমিয়া নিয়ে গবেষণাকারী বিজ্ঞানীরা প্রথম দিকে এই ধারণার যথার্থতা যাচাইয়ের দিকেই শুধুমাত্র মনযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তারা অন্য গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে কি পরিমাণ জৈবিক বস্তু পৃথিবীতে এসেছে তা পরিমাপ করার চেষ্টা করছেন। আন্তঃগ্রহিক এই যাত্রা শুরু করার আগে বস্তু গুলোকে আগে উল্কা বা ধুমকেতুর প্রভাবে তাদের নিজস্ব গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছে। মহাশূন্যে ভ্রমনের এই পর্যায়ে এসে প্রস্তর খন্ড বা ধূলিকণাগুলোকে অন্য গ্রহ বা উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং তারপরে যথেষ্ট পতনশীল বেগ অর্জন করতে হয়েছে সেই গ্রহের বায়ুমন্ডলকে ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ার জন্য। এই ধরনের স্থানান্তর খুব ঘন ঘনই সৌরজগতে ঘটেছে। দেখা গেছে গ্রহচ্যুত বস্তুদের সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহের তুলনায় দূরবর্তী গ্রহের দিকে এবং বৃহৎ গ্রহের উপর পতিত হওয়া সহজতর। ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাস্ট্রোফিজিসিষ্ট ব্রেট গ্লাডম্যান (Bret Gladman) এর করা ডাইনামায়িক সিম্যুলেশনের ফলাফল অনুযায়ী মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে বস্তুসমূহের স্থানান্তরের হার পৃথিবী থেকে মঙ্গলে স্থানান্তরের তুলনায় অনেক বেশি। এই কারণে প্যানস্পারমিয়ার  যে সম্ভাবনাটি ইদানিংকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত তা হচ্ছে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে অণুজীব বা এর প্রাক-অবস্থার স্থানান্তর।

মঙ্গলের উপর উল্কা বা ধুমকেতুর প্রভাব সংক্রান্ত সিম্যুলেশনে দেখা যায় যে, গ্রহচ্যুত বস্তুগুলো বিভিন্ন কক্ষপথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। গ্লাডম্যান এবং তার সহকর্মীরা হিসাব করে দেখলেন যে, প্রতি কয়েক মিলিয়ন বছরেই মঙ্গল উল্কা বা ধুমকেতুর প্রভাবে বড় ধরনের ঝাঁকুনি খায়। এতে করে এর পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রস্তরসমূহ বিচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে রওনা দেয় এবং পরবর্তীতে এর কিছু অংশ পৃথিবীতে এসে পতিত হয়। আন্তঃগ্রহিক যাত্রা সাধারণত খুবই সুদীর্ঘ হয়ে থাকে। মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে পতিত বেশিরভাগ ১ টনের উল্কাপিন্ডগুলো কয়েক মিলিয়ন বছর মহাকাশে কাটিয়ে তারপর পৃথিবীতে আসে। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ (প্রতি মিলিওনে ১টি) এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে এসে পড়ে। মুঠি সাইজের পাথরগুলো বছর তিনেকের মধ্যেই পৃথিবীতে পৌঁছে যায়। ছোট ছোট নুড়িপাথর বা ধূলিকণাগুলো আরো দ্রুতগতিতে আন্তঃগ্রহিক যাত্রা সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন হচ্ছে জৈবিক অস্তিত্ব এই সুদীর্ঘ মহাকাশ ভ্রমনে বেঁচে থাকতে পারবে কি না? প্রথমতঃ ধরা যাক, যে ভয়ংকর প্রভাবে উল্কাপিন্ড তার নিজস্ব গ্রহ থেক বিচ্যুত হচ্ছে তার প্রভাবে অণুজীবগুলো টিকে থাকতে পারবে কিনা? সাম্প্রতিক গবেষণাগার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কিছু ব্যাক্টেরিয়া উচ্চ চাপসম্পন্ন গ্রহচ্যুতির গতি এবং ধাক্কা সামাল দিয়ে টিকে থাকতে সক্ষম। অবশ্য যদি গ্রহচ্যুতির প্রাক প্রভাব এবং প্রচন্ড গতির কারণে যে তাপ উৎপন্ন হবে তাতে উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরের জৈবিক বস্তুকে একেবারেই ধ্বংস করে না দেয়।

প্লানেটারি ভূতত্ত্ববিদরা আগে বিশ্বাস করতেন যে, গ্রহচ্যুতির প্রাক-প্রভাব এবং মঙ্গলের মুক্তিবেগের চেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন যে কোন বস্তু নিশ্চিতভাবেই বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার কথা বা নিদেনপক্ষে গলে যাবে এটাই স্বাভাবিক। মঙ্গল বা চাঁদ থেকে আগত অগলিত এবং প্রায় অক্ষত উল্কাপিন্ড আবিষ্কৃত হওয়ার পর অবশ্য এই ধারণা পরবর্তীতে বাতিল হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি অফ আরিজোনার বিজ্ঞানী এইচ জে মেলোশ (H. Jay Melosh) হিসাব করে দেখান যে, মঙ্গলের স্বল্প সংখ্যক প্রস্তরখন্ড কোন রকম উত্তপ্ত না হয়েই পৃথিবীতে চলে আসতে পারে। মেলোশ বলেন যে, উল্কার বা ধুমকেতুর আঘাতে যে উর্ধ্বমুখী চাপের সৃষ্টি হয় তা ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে ১৮০ ডিগ্রি কোনে ঘুরে যায় ফলে ভূপৃষ্ঠের পাতলা একটি আস্তরণের নীচে এই চাপ বাতিল হয়ে যায়। একে বলা হয় ‘Spall zone’। ভূপৃষ্ঠের নীচের স্তর যেখানে ভয়ংকর চাপ অনুভব করে, সেখানে এই ‘Spall zone’ খুব কম চাপই অনুভব করে। ফলে পৃষ্ঠদেশের প্রস্তর অবিকৃত অবস্থায় প্রবল গতিতে মহাশূন্যে বিচ্যুত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার সময় টিকে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু? ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর এডওয়ার্ড এন্ডার্স (Edward Anders) দেখিয়েছেন যে, ইন্টার-প্লানেটারি ধূলিকণাগুলো পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে উঁচু স্তরে ধীরে ধীরে নেমে আসে। ফলে সেগুলো তেমন একটা উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু অন্যদিকে কিছুটা ভারী প্রস্তরখন্ড ধেয়ে আসে আক্ষরিক অর্থেই উল্কার গতিতে। ফলে তাদের উপরিভাগ প্রচন্ড তাপে গলে যায় পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার পর পরই। তবে এই তাপ উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে মাত্র কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত ঢুকতে পারে। কাজেই প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত অণুজীবগুলোর টিকে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি।




**চিত্র ৭.১ :** এ্যান্টার্কটিকার অ্যালান হিলে আবিস্কৃত হওয়া উল্কাপিন্ড ALH84001

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির ক্ষেত্রে পতিত উল্কাপিন্ডের সম্পর্ক থাকা পুরোপুরি অসম্ভব নয়। কিন্তু উল্কাপিন্ড শুধু পৃথিবীতেই আঘাত হানে না, অন্যান্য গ্রহেও তা টুপ টাপ ঝরে পড়ছে হর হামেশা। কাজেই অন্যান্য গ্রহেও জীবনের অস্তিত্ব থাকাকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না একেবারেই। মহাবিশ্বের অন্যত্র প্রাণের অস্তিত্ব থাকার এই তত্ত্ব জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল ALH84001 নামের উল্কাপিন্ডটি। গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা দুই ধরনের মঙ্গলের উল্কাপিন্ডকে বিশ্লেষণ করে আসছেন। এগারো মিলিয়ন বছর আগে উল্কা বা ধূমকেতুর আঘাতে মঙ্গল থেকে বিচ্যুত একগুচ্ছ প্রস্তর খন্ড যাদেরকে বলা হয় নাখলাইট (nakhlite) এবং এদেরও আরো চার মিলিয়ন বছর আগে মঙ্গল ত্যাগকারী উল্কাপিন্ড ALH84001.

NASA-র বিজ্ঞানী ডোনালড বোগার্ড (Donald Bogard) এবং প্রাট জনসন (Prat Johnson) প্রস্তর খন্ডের বুদ্বুদের মধ্যকার বাতাসকে অবিকৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তাদের হিউস্টন গবেষণাগারে পরীক্ষা করেন। তারা দেখেন যে এই বাতাস মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান ভাইকিং প্রেরিত মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। কাজেই সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ALH84001 একসময় মূলত মঙ্গলেরই অংশ ছিল। ১৯৯৬ সালে নাসার বিজ্ঞানী ডেভিড ম্যাককে (David Mckay) এবং তার সহকর্মীরা উল্কাপিন্ডটির মধ্যেকার মাইক্রোস্কোপিক ব্যাক্টেরিয়ার ফসিলের আকৃতির ছবি তোলেন। বিজ্ঞানীদের অবশ্য কোন ভাবেই প্রমাণ করার উপায় নেই যে, এই আকৃতি সত্যিই মঙ্গলের ব্যাক্টেরিয়ার ফসিল নাকি মাইক্রোস্কোপিক প্রস্তর গঠনের বিচিত্ররূপ মাত্র।



CARBONATE GLOBULE (*right*), about 200 microns long, seemingly formed in the Martian meteorite ALH84001. In the globule, a segmented object (*left*), some 380 nanometers long, vaguely resembles fossilized bacteria from Earth.

**চিত্র ৭.২ :** ALH84001 উল্কাপিন্ডে পাওয়া কার্বন যৌগ, পৃথিবীতে পাওয়া ব্যকটেরিয়ার জীবাশ্মের সাথে মিল পাওয়া যাচ্ছে।

ALH84001-এর বিস্ময়কর যাত্রা শুরু হয়েছিল মঙ্গল গ্রহ থেকে। এ গ্রহটি দীর্ঘদিন ধরেই পৃথিবীর বাইরে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনার নিরিখে বিজ্ঞানীদের পছন্দের তালিকার প্রথম দিকে আছে। পৃথিবী এবং মঙ্গলসহ সৌরজগতের সব গ্রহই তৈরি হয়েছে বিশাল ধুলি মেঘ সৌর নীহারিকা (Solar nebula) থেকে। মধ্যাকর্ষ এবং ঘূর্ণায়মান গতির কারণে ধূলিকণাগুলো কাছাকাছি এসে প্রথমে তৈরি হয়েছে নুড়ি, তারপর পাথর এবং সবশেষে বিশালাকৃতির পাথর যাকে বলা হয় "planetesimals". সৌরজগতের ইতিহাসের প্রথম এক বিলিয়ন বছরে planetesimal গুলো একটার সাথে আরেকটার অনবরত তৈরি হয়েছে মুহুর্মুহু সংঘর্ষ। বৃহৎ বস্তুর মধ্যাকর্ষ শক্তি সংঘর্ষমান বড় বড় পাথরগুলোকে একত্রিত করেছে এবং এই প্রক্রিয়া সৌর নীহারিকা পুরোপুরি গ্রহজগত এবং অন্যান্য উপাদান তৈরি হওয়া পর্যন্ত চলেছে। ইতোমধ্যে হালকা গ্যাস দিয়ে তৈরি কিন্তু গ্রহগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ভর সম্পন্ন সূর্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল সৌরজগতের কেন্দ্রে ।

৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরগুলোই কয়েকটি গ্রহে পরিণত হয়। আভ্যন্তরীণ তাপ এদেরকে আংশিকভাবে গলিয়ে ফেলে এবং মধ্যাকর্ষ এদের স্ফেরিক্যাল আকৃতি গঠন করে দেয়। মঙ্গলের পৃষ্ঠে সামান্য পরিমাণ কিছু রাসায়নিক পদার্থ রুবিডিয়াম (Rubidium), স্ট্রনটিয়াম (Strontium), আরগন (Argon), সামারিয়াম (Samarium), এবং নিওডাইমিয়াম (Neodymium) এর সংমিশ্রণে ছোট ছোট পাথরগুলো ক্রিস্টালাইজড হয়ে যায়। ALH84001 এদেরই একজন। এই সমস্ত পদার্থের সামান্য তেজস্ক্রিয়তাই উল্কাপিন্ডের মঙ্গলের উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মঙ্গলে পানি আছে কি নেই তা এক রহস্য। যদিও বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে বর্তমানে পানি আছে কিনা সে সম্পর্কে সরাসরি প্রমাণ পাননি, কিন্তু মঙ্গলের ইতিহাসে কোন একসময় যে পানি ছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্কাপিন্ড ALH84001-এ কার্বনেট, সালফেট এবং হাইড্রেট এর মত রাসায়নিক যৌগ পাওয়া গেছে যা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে শুধুমাত্র প্রস্তর খন্ডের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেই কেবল এগুলো পাওয়া সম্ভব। এই যৌগগুলো গঠিত হয়েছে যখন উল্কাপিন্ডটি মঙ্গলের অংশ হিসাবে ছিল।

এর মধ্যে মঙ্গলে উল্কাপিন্ডের আঘাতে সৃষ্ট তরঙ্গাঘাতের ফলে ALH84001 এ কিছু বুদবুদও তৈরি হয়েছে। উল্কার আঘাতে যে তাপের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ALH84001 এর বেশ কিছু অংশ গলে যায় এবং পরবর্তীতে ঠান্ডা হওয়ার পর এতে তৈরি হয় বুদবুদ। এই বুদবুদের মধ্যেই আটকা পড়ে গিয়েছিল মঙ্গলের বাতাস।

ALH84001 মঙ্গলের অংশ হিসাবে কাটিয়ে দেয় চার বিলিয়ন বছর। মঙ্গলে যদি কোন সময় চরমজীবী ব্যাক্টেরিয়া তৈরি হয়ে থাকে তবে সেগুলোর মধ্যে কিছু হয়তো এই ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ডের চারপাশে বা ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর প্রায় ১২ থেকে ১৭ মিলিয়ন বছর আগে অন্য এক উল্কার আঘাতে মঙ্গলের মায়া চিরতরে কাটিয়ে ALH84001 উৎক্ষিপ্ত হয় মহাশুন্যে। মহাশূন্যে থাকা অবস্থায় কসমিক রশ্মির (Cosmic Ray) পাল্লায় পড়ে ALH84001. এই কসমিক রশ্মি পৃথিবী বা মঙ্গলের বায়ুমন্ডলের কারণে ঢুকতে পারে না। কসমিক রশ্মির কারণে ALH84001 এর হিলিয়াম, নিওন এবং আরগন অণুর পারমাণবিক কেন্দ্রে কিছু পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন কোন গ্রহে অবস্থিত পাথর খন্ডের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। কোন একটি প্রস্তর খন্ডের রাসায়নিক পদার্থ, এয়ার বাবল এবং এর পরমাণুর মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে তা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন এর উৎস কোথায় এবং কোথা থেকে এসেছে।

এক অক্ষ থেকে অন্য অক্ষে ঘোরাঘুরি করতে করতে প্রায় তের হাজার বছর আগে ALH84001 জড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়াজালে এবং এসে পতিত হয় দক্ষিণ মেরুর আল্যান হিল (Allan Hill) নামের একটি হিমবাহের উপর। ১৯৮৪ সালে ভূতত্ত্ববিদ রবার্টা স্কোর (Roberta Score) দক্ষিণ মেরু যান উল্কাপিন্ডের সন্ধানে। মঙ্গল থেকে আগত ৪.২ পাউন্ডের ALH84001 খুঁজে পান তিনি। উল্কাপিন্ডের নামের ALH এসেছে Allan Hill থেকে এবং 84 এসেছে ১৯৮৪ সালে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশ্য দেখা গেছে যে ALH84001 এন্টার্কটিকা বরফের এমিনো এসিড দিয়ে ব্যাপকভাবে দূষিত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে অবশ্য ALH84001-এ মঙ্গলের মাইক্রো-ফসিলের দাবী দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উল্কাপিন্ডদের চৌম্বকীয় ধর্ম এবং এদের অভ্যন্তরে আটকে পড়া গ্যাসের গঠন-উপাদান বিশ্লেষণ করে বি পি ওয়েস (B. P. Weiss) এবং তার সহকর্মীরা দেখতে পেলেন যে, ALH84001 এবং সাতটি নাখলাইটের মধ্যে কমপক্ষে দু'টো মঙ্গলের পৃষ্ঠ ছাড়ার পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উত্তপ্ত হয়নি। অধিকন্তু নাখলাইটগুলো যেহেতু অবিকৃত, তারমানে উচ্চ-চাপযুক্ত শকওয়েভ এদের গায়ে আচড় বসাতে পারেনি এবং এদের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উঠেনি।

পৃথিবীর অনেক আদিকোষী prokaryote (সরল এককোষী জীব যাদের নিউক্লিয়াসে ঝিল্লি নেই, যেমন ব্যাক্টেরিয়া) এবং প্রকৃতকোষী eukaryotes (সুনির্দিষ্ট নিউক্লিয়াস-বিশিষ্ট জীব) এই তাপমাত্রার টিকে থাকতে পারে। ওয়েসের গবেষণার এই ফলাফলই সর্বপ্রথম

পরীক্ষাপ্রাপ্ত প্রমাণ যাতে দেখা যায় যে, বস্তুখন্ড মূল গ্রহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়া থেকে শুরু করে পতন পর্যন্ত কোন পর্যায়েই এমন তাপমাত্রায় না পৌঁছেও এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে পরিভ্রমণ করতে পারে যাতে এর অভ্যন্তরস্থ জৈবিক প্রাণ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে না যায়।

প্যানস্পারমিয়া সংঘটনের ক্ষেত্রে অণুজীবদের শুধুমাত্র প্রথম গ্রহের বিচ্যুত এবং দ্বিতীয় গ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রবেশের সময়ই টিকে থাকতে হয় না বরং একই সাথে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে ভ্রমনের মধ্যবর্তী সময়টাতেও টিকে থাকতে হয়।

জীবনবাহক উল্কাপিন্ডদেরকে মহাকাশের শুন্যতা, তাপমাত্রার চরম অবস্থা এবং কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের বিকিরণকে মোকাবিলা করতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে সূর্যের উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন অতিবেগুনী রশ্মি (Ultra violet Ray বা UV) যা জৈবিক অণুর কার্বন পরমাণুর বন্ধনকে ভেঙ্গে দেয়। তবে UV থেকে বাচাঁর উপায়ও খুব সোজা। এক মিটারের মিলিয়ন ভাগের একভাগ সমান দৈর্ঘের অসচ্ছ বস্তুই একটি ব্যক্টেরিয়াকে রক্ষা করার জন্যই যথেষ্ট।



**চিত্র ৭.৩ :** নাসার LDEF ছয় বছর ধরে মহাশূন্যে Bacillus Subtilis ব্যকটেরিয়ার অনুজীব বহন করেছিল। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, খুব পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের আস্তরণই আশি শতাংশ অনুজীবকে তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯৮৪ সালে উৎক্ষিপ্ত এবং এর ছয় বছর পর কক্ষপথ থেকে ফিরিয়ে আনা নাসার স্যাটেলাইট Long Duration Exposure Facility (LDEF) কে ব্যবহার করা এক পরীক্ষায় দেখা যায় যে, পাতলা একটি এলুমিনিয়ামের আস্তরনই ব্যক্টেরিয়া প্রজাতি *Bacillus subtilis* এর অণুবীজ (spore) এর ক্ষেত্রে অতিবেগুনী রশ্মির বিপক্ষে ঢাল হিসাবে যথেষ্ট ছিল। UV থেকে রক্ষিত হওয়া কিন্তু মহাকাশের অসীম শূন্যতা এবং চরম তাপমাত্রা মোকাবেলা করা ওই সমস্ত স্পোরের আশি শতাংশই মিশন শেষে টিকে ছিল। অন্যদিকে এলুমিনিয়াম ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ না করা অণুবীজগুলোর যদিও অধিকাংশই অতিবেগুনী রশ্মির আক্রমনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরও সবগুলো কিন্তু নয়। UV ঢালবিহীন অণুবীজগুলোর প্রতি দশ হাজারে অন্ততঃ একটি অণুবীজ বেঁচে ছিল। গ্লুকোজ এবং লবনের মতো উপাদানের উপস্থিতি তাদের টিকে থাকার হারকে বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেছে ক্ষুদ্র ধূলিকণার আস্তরণের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্টেরিয়ার কলোনীকে সৌর বিকিরণ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে পারে না। আর এই কলোনি যদি নুড়ি আকৃতির কোন প্রস্তর খন্ডের মধ্যে থাকে তবে সেটার অতিবেগুনী রশ্মি প্রতিরোধের ক্ষমতা বেড়ে যায় অনেক অনেক বেশি পরিমাণে।

যেহেতু এই গবেষণা হয়েছিল পৃথিবীর চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের অনেক ভেতরে স্বল্পমাত্রার দূরত্বের কক্ষপথে। কাজেই এই গবেষণা আন্তঃগ্রহিক আহিত কণা (Charged Particles)-এর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম হয়নি। কারণ এই চার্জড পার্টিকল পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। মাঝে মাঝে সূর্য বিপুল পরিমাণ এনার্জেটিক আয়ন এবং ইলেকট্রন উদগীরণ করে থাকে। এ ছাড়া মহাজাগতিক বিকিরণের মূল উপাদান চার্জড পার্টিকলগুলো প্রতি মুহুর্তেই আঘাত হানছে সৌরজগতে। জীবন্ত সত্ত্বাকে চার্জড পার্টিকল বা গামা রশ্মির মতো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিকিরণ থেকে রক্ষা করা অতি বেগুনী রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করার চেয়ে অনেক জটিলতর। সামান্য কয়েক মাইক্রণ প্রশস্ত প্রস্তরের স্তর বা ঢাল (shielding) অতি বেগুনী রশ্মিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম। কিন্তু অতিরিক্ত শিলডিং বস্তুত অন্য ধরনের বিকিরণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। আহিত কণা এবং উচ্চ শক্তির ফোটন শিলডিং এর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে অসংখ্য মাধ্যমিক বিকিরণের জন্ম দেয়।

দুই মিটার বা তার চেয়ে বেশি ব্যাসের প্রস্তর না হলে এই বিকিরণ উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরের যে কোন অণুজীবকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, বড় ধরনের প্রস্তরখন্ডগুলো খুব দ্রুত আন্তঃগ্রহিক পরিভ্রমন সাধারণত করে না। কাজেই UV প্রতিরোধের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মহাকাশের বিকিরণকে একটি অণুজীব কতখানি সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং কত দ্রুত জীবন বহনকারী উল্কাপিন্ড এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে

যেতে পারে। ভ্রমণ যত দ্রুত হবে বিকিরণের মাত্রা তত কম হবে। ফলশ্রুতিতে অণুজীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে।

B. subtilis বিকিরণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বেশ শক্তপোক্ত। ১৯৫০ সালে কৃষি বিজ্ঞানী আর্থার ডব্লিউ এন্ডার্সনের (Arthur W. Anderson) আবিষ্কৃত ব্যাক্টেরিয়াল প্রজাতি Deinococus radiodurans অবশ্য B. subtilis এর চেয়েও বেশি বিকিরণ প্রতিরোধে সক্ষম। খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করতে যে পরিমাণ বিকিরণ প্রয়োগ করা হয় তা উপেক্ষা করেও এরা টিকে থাকতে পারে। এমনকি আণবিক চুল্লিতেও এরা বেঁচে বর্তে থাকতে পারে।

Deinococus radiodurans এর ডিএনএ মেরামত করার জন্য যে কোষীয় প্রক্রিয়া সাহায্য করে তাই এর কোষের চারপাশে অতিরিক্ত মোটা দেয়াল তৈরি করে ফেলে। এই ডিএনএ বিকিরণ থেকে বাঁচানোর সাথে সাথে পানিশূন্যতার ফলে যে ক্ষতি হয় তাও পূরণ করার চেষ্টা করে। তাত্ত্বিকভাবে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন জীবাণুসমূহ যদি মঙ্গল থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন উল্কাপিন্ড যা ALH84001 বা অন্য কোন নাখলাইটের মত উত্তপ্ত না হয় তবে ওই সমস্ত জীবাণুর একটা অংশ দীর্ঘ সময় পরেও টিকে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বাইরে স্পোর বা জটিল অণুদের সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার বিষয়ে সত্যিকার অর্থে তেমন কোন পরীক্ষা করা হয়নি। এই ধরনের পরীক্ষা চন্দ্রপৃষ্ঠে করা সম্ভব। জৈবিক বস্তুসমুহ সিম্যুলেটেড উল্কাপিন্ডের মধ্যে ভরে মহাকাশে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে দেখা যেতে পারে সেগুলোতে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে। এপোলো মিশনে কিন্তু জৈবিক নমুনা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে যেহেতু এই নমুনা নভোযানের ভেতরেই ছিল কাজেই সেগুলো পুরোপুরি মহাজাগতিক বিকিরণে আক্রান্ত হয়নি। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা জৈবিক নমুনা চন্দ্রপৃষ্ঠে বা মহাকাশের কোথাও রেখে দিতে পারেন এবং বেশ কয়েক বছর পর পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বেশ গুরুত্বের সাথেই এই ধারণাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন।

ইতোমধ্যে অবশ্য দীর্ঘমেয়াদী Martian Radiation Environment Experiment (MARIE) চালু হয়ে গেছে। ২০০১ সালে মঙ্গলের ওডিসি অর্বিটারের (Odyssey Orbiter) অংশ হিসাবে এই প্রকল্প চালু হয়। MARIE-এর যন্ত্রপাতিসমূহ নভোযান মঙ্গলের চারপাশে ঘোরার সময় মহাজাগতিক বিকিরণ এবং সূর্যের আহিত কণাদের পরিমাণ মেপে নিচ্ছে। যদিও MARIE-তে কোন জৈবিক বস্তু নেই তবুও এর সংবেদক (sensor) এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এটা ডিএনএ এর জন্য ক্ষতিকর বিকিরণকে চিহ্নিত করতে সক্ষম।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাত্ত্বিকভাবে প্যানস্পারমিয়া ঘটা অসম্ভব নয়। এই অনুকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একে সম্ভাবনা থেকে বস্তুনিষ্ঠ (Quantitative) বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উল্কা সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সৌর জগতের আদি থেকেই বস্তুপিন্ড এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে এবং বর্তমানেও তা বেশ ব্যাপকভাবেই ঘটে চলেছে। তাছাড়া, গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মঙ্গল থেকে বিচ্যুত উল্কাপিন্ডের অভ্যন্তরে বেশ ভাল সংখ্যক অণুজীবই বিচ্যুতির ধাক্কা এবং পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশের বিপদসংকুল অবস্থাকে সামাল দিয়ে টিকে থাকতে পারে। কিন্তু প্যানস্পারমিয়া অনুকল্পের অন্য অংশগুলো এতো সহজে প্রমাণ করা যায় না। *B. subtilis* বা *D. radidurans*-এর মতো বিকিরণ প্রতিরোধক জীবাণুর আন্তঃগ্রহিক পরিভ্রমণে টিকে থাকতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে গবেষকদের আরো অনেক বেশি তথ্য-প্রমাণ দরকার। তারপরও এ ধরনের গবেষণা পৃথিবীর প্রাণিমন্ডলে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল তা কখনই প্রকাশ করতে পারবে না, কেননা পরীক্ষাগুলো বর্তমান পৃথিবীর 'প্রাণ' নিয়ে জড়িত। কয়েক বিলিয়ন বছর আগের জীবাণুদের টিকে থাকার ক্ষমতা হয়তো একনকার তুলনায় ভিন্ন ছিল। হয়তো বা বেশি ছিল বা হয়তো কম ছিল।

এছাড়াও, বিজ্ঞানীরা এখনো সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেননি যে পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন গ্রহে একসময় প্রাণ ছিল। অন্য কোন গ্রহে অজৈবজনি (abiogenesis) ঘটার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন ধরনের সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিজ্ঞানীরা কোন ধরণের প্রাণেরই উৎপত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নন। সহায়ক উপাদান এবং পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও 'প্রাণ'-এর উৎপত্তি হতে হয়তো কয়েক মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে অথবা এর বিপরীত হতে পারে। প্রাণের বিকাশের জন্য হয়তো মিনিট পাঁচেক সময় লেগেছে। আমরা শুধু এইটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, ২.৭ বিলিয়ন বা তার কয়েক মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে 'প্রাণ' তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

যেহেতু এই মুহূর্তে প্যানস্পারমিয়া দৃশ্যপটের সবগুলো ধাপকেই পরিমাপযোগ্য করা সম্ভব নয়, কাজেই গবেষকরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে কি পরিমাণ জৈবিক পদার্থ বা জীবন্ত কোষ পৃথিবীতে এসেছে তা পরিমাপ করতে পারছেন না। অধিকন্তু, জীবন্ত কোষের স্থানান্তরই প্রমাণ করে না যে গ্রহনকারী গ্রহে এর কারণেই প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে ওই গ্রহে যদি আগে থেকেই প্রাণের অস্তিত্ব থাকে তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আরো কঠিন। উদাহরনস্বরূপ বলা যায় যে, যদি পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তির পর মঙ্গলের অণুজীব পৃথিবীতে এসেও থাকে তবে তা হয়তো পৃথিবীর প্রাণসমূহকে প্রতিস্থাপিত বা পৃথিবীর প্রাণের সাথে সহাবস্থান কোনটাই করতে পারেনি। তবে এটাও সম্ভব যে, মঙ্গলের প্রাণ হয়তো পৃথিবীতে আমাদের নাকের ডগাতেই আছে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত খুঁজে পাননি। এ পর্যন্ত পৃথিবীর

সকল ব্যাক্টেরিয়া প্রজাতির মাত্র কয়েক শতাংশকে চিহ্নিত করা গেছে। পৃথিবীর প্রাণের সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে অসম্পর্কযুক্ত প্রাণগুলো এখন পর্যন্ত চিহ্নিত না হয়ে থাকা বিচিত্র কিছু না।

অন্য কোন গ্রহে প্রাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা হয়তো প্যানস্পারমিয়া আদৌ ঘটেছে কিনা বা কি পরিমানে ঘটেছে তা জানতে সক্ষম হবেন না। ধরা যাক, ভবিষ্যতের কোন অনুসন্ধান মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পেল এবং জানালো যে মঙ্গলের জৈব-রসায়ন আমাদের পৃথিবীর তুলনায় পুরোপুরি ভিন্ন। সেক্ষত্রে বিজ্ঞানীরা তাৎক্ষনিকভাবেই জেনে যাবেন যে, পৃথিবীর 'প্রাণ' মঙ্গল থেকে আসেনি। কিন্তু জৈব-রসায়ন যদি একই রকমের হয় তবে এই ধরনের একটি অনুমানে আসা যেতে পারে যে এদের উৎস হয়তো বা একই। ধরে নেওয়া যাক যে, মঙ্গলের 'প্রাণ' বংশগতীয় তথ্য মজুদ করার জন্য ডিএনএ ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞানীরা নিউক্লিওটাইড অণুক্রম বিশ্লেষণ করে বের করতে পারবে যে মঙ্গল এবং পৃথিবীর প্রাণের উৎস একই কিনা। পৃথিবীর প্রাণীদের মত প্রোটিন তৈরির জন্য মঙ্গলের প্রাণীদের ডিএনএ অণুক্রম যদি একই বংশগতীয় সঙ্কেত অনুসরণ না করে তবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে, মঙ্গল-পৃথিবী প্যানস্পারমিয়া অনিশ্চিত। কিন্তু এর বাইরেও আরো অনেক সম্ভাবনা থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা হয়তো দেখতে পারেন যে, মঙ্গলের প্রাণীরা প্রতিরূপ সৃষ্টির জন্য আরএনএ বা অন্য কিছুকে ব্যবহার করে থাকে।

পৃথিবীতে 'প্রাণ' নিজস্ব ভাবে তৈরি হোক বা বহির্বিশ্ব থেকে আসুক অথবা এর মধ্যবর্তী অন্য কোন পরিস্থিতিতেই উৎপন্ন হোক না কেন সঠিক উত্তরটি জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গল-পৃথিবীর প্যানস্পারমিয়া যদি সত্যি হয় তবে বোঝা যাবে যে, প্রাণ যেখানেই উৎপন্ন হোক না কেন, উৎপত্তির পর তা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম। তবে অন্যদিকে, বিজ্ঞানীরা যদি দেখেন যে মঙ্গলের প্রাণ স্বতন্ত্রভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে  জড় থেকে জীবের 'অজৈবজনি' মহাবিশ্বের যে কোন জায়গাতেই খুব সহজেই ঘটতে পারে।

অক্টোবর ১৮, ২০০৬

---

{ *সপ্তম অধ্যায়, প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# মহাবিশ্বে প্রাণ এবং বুদ্ধিমত্তার সম্ভাব্যতা

## (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –৮)

ফরিদ আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে
পৃথিবীর সব গল্প ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :...
–জীবনানন্দ দাশ

## ড্রেকের সমীকরণ (Drake's Equation)

বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে সৌর জগতের বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য একদল বিজ্ঞানী এবং প্রকোশলী ১৯৬১ সালে জড়ো হয়েছিলেন ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীনব্যাংক মানমন্দিরে। সম্মেলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমত্তা অনুসন্ধানে অগ্রণী কর্মী। তিন দিনের সম্মেলন শেষে জন লিলির (John Lilly) ডলফিনের বুদ্ধিমত্তার গল্প শুনে তারা নিজেদের নামকরণ করেন The Order of the Dolphin হিসাবে।

এই সম্মেলনেই জোতির্বিদ ফ্রাঙ্ক ড্রেক (Frank Drake) সুবিশাল এই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান সভ্যতা পরিমাপ করার একটি পদ্ধতি প্রস্তাব করেন। তিনি তার এই পদ্ধতি একটি সমীকরণ আকারে উপস্থাপন করেছিলেন। সমীকরণটি নিম্নরূপ,

$$N = R^{*} . F_p . N_e . F_l . F_i . F_c . L$$

যেখানে,
$N$= সভ্যতার সংখ্যা
$R^*$= প্রতি বছর আমাদের ছায়াপথে জন্ম নেওয়া জীবন সহায়ক নক্ষত্রের সংখ্যা
$F_p$= এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা
$N_e$= প্রতিটি নক্ষত্রের গ্রহজগতের মধ্যে প্রাণ সহায়ক গ্রহের সংখ্যা

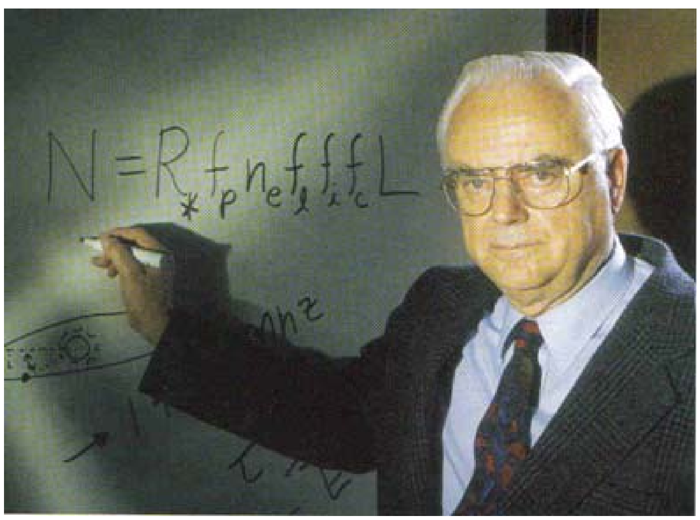
$F_l$= প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা

$F_i$= প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা

$F_c$= বুদ্ধিমান প্রাণী যারা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে।

L= ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল

ড্রেকের সমীকরণে, আমাদের ছায়াপথে প্রতিবছর জন্ম নেওয়া নক্ষত্রের সংখ্যাকে, এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা, যেগুলোতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহজগতের গড় সংখ্যা , প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা, প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা, বুদ্ধিমান প্রাণী মহাবৈশ্বিক যোগাযোগের উপায় বের করেছে এমন গ্রহের সংখ্যা এবং ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কালের ভগ্নাংশ দিয়ে গুণ করে N বা মহাজাগতিক সভ্যতার সংখ্যা বের করা হয়।



**চিত্র ৮.১:** ফ্রাঙ্ক ড্রেক এবং তার বিখ্যাত সমীকরণ।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। ধরা যাক, কোন একটি কোন  স্কুলের একটি নির্দিষ্ট বছরে পাশ করা ছাত্রদের মধ্যে কতজন জোতির্বিজ্ঞানী হবে তার একটি ধারণা করা হচ্ছে। মনে করা যাক, এই স্কুল থেকে প্রতিবছর এক হাজার ছাত্র পাশ করে বের হচ্ছে। এই সংখ্যাকে গুন করতে হবে এই ছাত্রদের মধ্যে যারা একদিন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বের হবে সেই ভগ্নাংশ দিয়ে। ধরা যাক, ৬০ শতাংশ (০.৬) ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে পাশ করে বের হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রদের থেকে প্রতি দশজনের মধ্যে তিনজন বা ৩০ শতাংশ (০.৩) বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবে। এদের মধ্যে হয়তো মাত্র ১১ শতাংশ (০.১১) জোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার জন্য আবেদন করবে। ধরে নিই নাসা (NASA) প্রতি পাঁচ বছরে একবার করে জোতির্বিজ্ঞানী নিয়োগ প্রদান করে এবং আবেদনকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে মাত্র এক শতাংশকে কাজে যোগ্দানের সুযোগ দেয়। এখন, সমস্ত সংখ্যাগুলোকে একত্রে গুন করলে পাওয়া যাচ্ছে ১ (১০০০ x ০.৬ x ০.৩ x ০.১১ x ০.০১ = ১)। অর্থাৎ এই স্কুলের পাশকৃত ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজনের জোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

Order of the Dolphin এর সদস্যরা এই সমীকরণের মানগুলির জ্ঞানভিত্তিক অনুমান (educated guess) করার চেষ্টা করেন এবং প্রতিটি মানের বাস্তবভিত্তিক উচ্চসীমা এবং নিম্নসীমা নির্ধারণ করে দেন। যেহেতু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন দেওয়ার মতো সরাসরি পর্যবেক্ষণমূলক যথেষ্ট তথ্য প্রমানাদি হাতে ছিল না, কাজেই মূলতঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন জোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানে তাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপর তারা নির্ভর করেছিলেন। যদিও এই মানগুলো তাত্ত্বিক যুক্তির উপরেই মূলতঃ নির্ভরশীল ছিল, তা সত্ত্বেও আজ এতদিন পর তাদের দেওয়া মানগুলোই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত যত ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তার কোনটিই বড় ধরনের কোন মতানৈক্য তৈরি করতে পারেনি সেই মানগুলো সম্পর্কে।

## R*- প্রতি বছর আমাদের ছায়াপথে জন্ম নেওয়া জীবন সহায়ক নক্ষত্রের সংখ্যা

ড্রেক যখন তার সমীকরণটি দাঁড় করান তখন এই একটমাত্র ফ্যাক্টর যা প্রকৃত তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ১৯৬১ সালে বিজ্ঞানীরা জানতেন যে মিল্কিওয়ে ছায়াপথ (যাকে আমরা অনেকে ‘আকাশ গঙ্গা’ নামে ডাকি) প্রায় দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে জন্ম নিয়েছে এবং প্রায় কয়েক বিলিয়ন নক্ষত্রের সমাহারে গড়ে উঠেছে এই ছায়াপথ। যদি ছায়াপথ তার জন্মের পর থেকে একই হারে নক্ষত্রের জন্ম দিয়ে থাকে তবে প্রতি বছর প্রায় বিশটি করে নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে। গ্রীনব্যাংকের বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছিলেন যে এদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক নক্ষত্রই পৃথিবীর মত গ্রহ থাকার জন্য যথেষ্ট স্থিতিশীল এবং দীর্ঘজীবি হওয়ার কথা। কাজেই তারা R*-এর মান নির্ধারণ করলেন প্রতি বছরে ১০।

আজকে আমরা দূরবর্তী ছায়াপথের গবেষণা থেকে জানি যে ছায়াপথে নক্ষত্রের জন্মহার সময়ের সাথে সাথে কমে যেতে থাকে। আমরা যেহেতু এই মুহূর্তে সভ্যতা খুঁজছি কাজেই আমরা অনেক বেশি আগ্রহী সেই সব নক্ষত্রের প্রতি যেগুলো পাঁচ থেকে দশ বিলিয়ন বছর আগে সূর্যের কাছাকাছি সময়ে জন্ম নিয়েছে। তখন থেকে নক্ষত্রের জন্মহার প্রতি বছরে দশ

থেকে পাঁচে নেমে গেছে যা ড্রেকের অনুমানের চেয়ে অনেক কম। তবে এখানেই কাহিনীর শেষ নয়।

এদের মধ্যে বেশিরই ভাগই হচ্ছে অত্যন্ত অনুজ্জ্বল, স্বল্প ভরের নক্ষত্র যা লাল বামন (Red Dwarf) নামে পরিচিত। জীবন সহায়ক গ্রহের উপস্থিতির সম্ভাবনা হিসাবে লাল বামন তারাগুলোকে অনেক আগেই বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের নক্ষত্রগুলোকে পরিভ্রমণরত গ্রহগুলোকে পর্যাপ্ত উষ্ণতা পেতে হলে নক্ষত্রের এতখানি কাছাকাছি থাকতে হয় যে এতে করে গ্রহগুলো সমকালীন ঘূর্ণনে (synchronous rotation) আবদ্ধ হয়ে যেতে হয়। ‘সমকালীন ঘূর্ণন’ হচ্ছে এমন অবস্থা যেখানে গ্রহের এক গোলার্ধ চিরকাল নক্ষত্রের দিকে মুখ করে থাকে ফলে সেই গোলার্ধের তাপমাত্রা হয় অসম্ভব রকমের বেশি। অন্যদিকে অন্য গোলার্ধ যা আজীবনের জন্য অবস্থান করে নক্ষত্রের বিপরীত দিকে তা পরিনত হয় এমনই ঠান্ডায় যে এই গোলার্ধের গ্যাসীয় মন্ডল পর্যন্ত জমাট হয়ে পৃষ্ঠদেশে জমা হয়ে যায়। এই ভয়ংকর চরম তাপমাত্রায় প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করাই দুরূহ। অবশ্য বর্তমানে লাল বামন তারাদের গ্রহদের এই ভয়ংকর পরিবেশের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান গবেষনাসমূহ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, বাতাস উষ্ণ গোলার্ধ থেকে তাপ বহন করে শীতল অংশে নিয়ে যায়। এতে করে উষ্ণ এবং শীতল অংশের সঙ্গমস্থলে এমন একটি সহনীয় পর্যায়ের তাপমাত্রার অঞ্চল তৈরি হয় যে সেখানে জীবনের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

কাজেই সব লাল বামন তারাকে হিসাবের মধ্যে নিলে বর্তমানে $R^*$ এর মান বছরে ৫ থেকে ১০ আসে যা ১৯৬১ সালের হিসাবের অনুরূপ।

## $F_p$- এই নক্ষত্র গুলোর মধ্যে যে গুলোতে গ্রহজগত আছে তার সংখ্যা

১৯৬১ সালে জোতির্বিদরা সূর্য ছাড়া এমন একটাও নক্ষত্র খুঁজে পাননি যেটাতে গ্রহমন্ডল আছে। তা সত্ত্বেও Order of the Dolphin এর সদস্যরা সেই সময়কার প্রচলিত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ধরে নিয়েছিলেন যে, এই মহাবিশ্বে গ্রহের উপস্থিতি অতি স্বাভাবিক ঘটনা এবং মহাবিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক নক্ষত্রেরই গ্রহমন্ডল থাকবে বলে তারা মত দিয়েছিলেন।

আজকে আমাদের জ্ঞানের যে পর্যায় তাতে আমরা গ্রীন ব্যাংকের বিজ্ঞানীদের চেয়ে আরো ভালভাবে এই হিসাব করতে পারি। ১৯৯৫ সাল থেকে বিজ্ঞানীদের বেশ কয়েকটি দল ১৭০ টিরও বেশি নক্ষত্র খুঁজে পেয়েছেন যাদের আমাদের সৌরজগতের মতই গ্রহজগত রয়েছে। যে সমস্ত নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে কমপক্ষে দশ শতাংশেরই গ্রহজগত আছে। তবে এ সংখ্যাও যে পুরোপুরি সঠিক তা বলা যায় না। বর্তমান প্রচলিত প্রযুক্তি নেপচুনের

চেয়ে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে কক্ষপথে ভ্রাম্যমান গ্রহদেরকে চিহ্নিত করতে পারে না। এর মধ্যে আবার বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের এমন সব জায়গায় গ্রহ আবিষ্কার করছেন যেখানে গ্রহ থাকার সম্ভাবনাকে একসময় নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে দ্বৈত নক্ষত্রের (Double Stars) কথা বলা যেতে পারে। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের জিওফ মার্সির (Geoff Marcy) মতে মহাবিশ্বে গ্রহসহ নক্ষত্রের সংখ্যা সম্ভবত নব্বই শতাংশের মতো।

## $N_e$- প্রতিটি নক্ষত্রের গ্রহজগতের মধ্যে প্রাণ সহায়ক গ্রহের সংখ্যা

একসময় বিজ্ঞানীরা আমাদের সৌরজগতে ভেনাস থেকে মঙ্গল পর্যন্ত একটি কাল্পনিক এলাকাকে প্রাণের সহায়ক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন যদিও ভেনাস এবং মঙ্গলকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আমাদের সৌরজগতে একটিমাত্র গ্রহ পৃথিবীতেই শুধুমাত্র প্রাণ-সহায়ক পরিবেশ আছে বা প্রাণের বিকাশ ঘটেছে। কাজেই এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীরা ওই সময় $N_e$ এর মান হিসাবে ১ কে ধরে নিয়েছিলেন।

গত কয়েক দশকের সবচেয়ে বিস্ময়কর উপলব্ধি হচ্ছে যে প্রাণকে একসময় যতটা নাজুক মনে করা হতো আসলে তা নয়। প্রাণ অনেক কঠিন পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। আমাদের সৌরজগতের অনেক গ্রহকেই আগে যতখানি রুদ্রমুর্তির মনে করা হতো তারা আসলে ততখানি নিষ্ঠুর নয়। কিছু চরমজীবী (extremophiles) পাওয়া গেছে সাগরের তলদেশে যেখানকার তাপমাত্রা ফুটন্ত পানির চেয়েও বেশি, পাওয়া গেছে হীমশীতল মেরুর বরফের মধ্যে, পাওয়া গেছে মাটির অনেক গভীর তলদেশে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমনই শক্তপোক্ত যে তাদের টিকে থাকার জন্য কোন অক্সিজেনেরই প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের প্রাণীদের পক্ষে মঙ্গলের ভূগর্ভস্থ সাগরে, কিম্বা বৃহস্পতির তিন বরফে আচ্ছাদিত উপগ্রহের জমাট বরফের নিচের জলীয় অংশে বা শনির উপগ্রহ টাইটানের হাইড্রো-কার্বন আচ্ছাদিত পৃষ্ঠদেশের নিচে অবস্থিত পানিতে খুব অনায়াসেই টিকে থাকা সম্ভব। কাজেই দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের প্রাণ-সহায়ক এলাকার ধারণা আগে ছিল অনেক বেশি সীমাবদ্ধ। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, প্রত্যেকটা গ্রহমন্ডলেই একাধিক গ্রহ থাকতে পারে যেখানে প্রাণের জন্য সহায়ক পরিবেশ বিদ্যমান।

## $F_l$- প্রাণের বিকাশ সম্ভব এমন গ্রহসমূহের মধ্যে সত্যিকারভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে এমন গ্রহের সংখ্যা

ড্রেকের সমীকরণের ভিতরে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই এর রাশিগুলোর মান অনিশ্চিত হতে থাকে। আমরা এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহতে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাইনি। কাজেই আমাদের কাছে কোন বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নেই যার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্তে

পৌছাতে পারি যে জীবনের বিকাশ হঠাৎ করে একবারই ঘটেছে নাকি এর উৎপত্তি মহাবিশ্বে অনিবার্য ছিল।

দিন দিন অবশ্য যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটার ক্ষেত্রই উজ্জ্বল হচ্ছে। পৃথিবীতে প্রাণের মৌলিক উপাদান হচ্ছে পানিসহ মাত্র ডজন দু'য়েক অণু। আর এ সমস্ত অণু নক্ষত্রের জন্মস্থান নাক্ষত্রিক মেঘে বিপুল পরিমানে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে গ্রহসমূহে জমাট আকারে থাকা কার্বন কনিকা গুলো প্রোটিন গঠনের উপাদান এমিনো এসিড তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। এ ব্যাপারটি সত্যি হলে ছায়াপথের যে কোন নক্ষত্রেই গ্রহ জন্মের সময়ই এতে জীবন গঠনের উপাদানসমূহ থেকে যাওয়ার কথা।

ড্রেক এবং তার সহকর্মীরা খুব পরিমিতভাবেই $F_l$ এর মান ধরেছিলেন দশ শতাংশ যা এখনকার পরিপ্রেক্ষিতেও যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য এই মান লাফ দিয়ে বেড়ে যেতো যদি পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো।

## $F_i$- প্রাণের বিকাশ হওয়া গ্রহসমূহের মধ্যে আবার যে গুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ হয়েছে তার সংখ্যা

স্টিফেন জে গুল্ড (Stephen Jay Gould) মানুষকে 'বিবর্তনের দুর্ঘটনা' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসের সামান্যতম হেরফের হলেই হয়তো আমরা এই ধরণীতে অবতীর্ণ হতাম না। কিন্তু কথা হচ্ছে মানুষ না থাকলেও বিবর্তন কি অন্য কোন চিন্তাশীল বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশ ঘটতো? অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, বুদ্ধিমত্তা কি এতই অত্যাবশ্যকীয় যে তা আজ হোক বা কাল হোক আত্মপ্রকাশ করবেই?

একটা উপায়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়, তা হচ্ছে পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণী বুদ্ধিমত্তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিনা? ডলফিনের ফসিলের খুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, গত পঞ্চাশ মিলিয়ন বছরে এর মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমাগত। আরো অসংখ্য প্রাণী বিশেষ করে কিছু তিমি এবং পাখি গত দশ মিলিয়ন বছরে তাদের শরীরের তুলনায় ক্রমবর্ধমানহারে মগজের আকৃতি বৃদ্ধি করে চলেছে। কয়েক দশক আগে ড্রেক এবং তার সহযোগীরা $F_i$ -এর মান ধরে নিয়েছিলেন ১ এর কাছাকাছি। বর্তমানে আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে যে, বিবর্তনের যাত্রাপথ বুদ্ধিমত্তার উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করে।

## $F_c$- বুদ্ধিমান প্রাণী যারা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে।

কোন একটা প্রাণী বুদ্ধিমান হলেই যে মহাকাশে বেতার তরঙ্গ পাঠাবে তা নাও হতে পারে। কারণ হতে পারে এ মহাবিশ্বে অসংখ্য গ্রহ আছে যার অধিবাসীরা হয়তো দক্ষ ভাষাবিদ, অসাধারণ কবি, সুরকার কিন্তু বেতার জ্যোতির্বিদ্যায় অক্ষম। ফলে তাদের পক্ষে বেতার তরঙ্গ প্রেরণ বা শ্রবণ হয়ত সম্ভব নয়। এমনকি আমাদের পৃথিবীতেও খুব কম সংখ্যক জাতিই বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রাচীন গ্রীস বা ভারতবর্ষের কথা বলা যায়। এখানে দার্শনিক উন্নয়ন যতটা হয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সেভাবে হয়নি। সব জাতিকেই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটাতে হবে তা কিন্তু নয়।

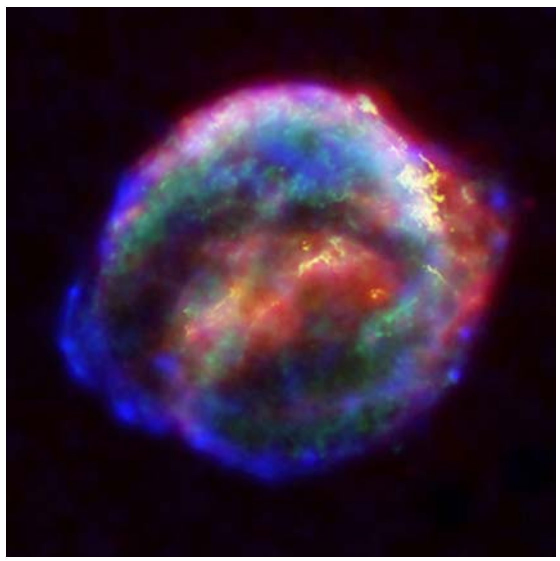
তারপরও এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে কোন একটি প্রজাতির যদি কথা বলার মতো বুদ্ধিমত্তা থাকে এবং সেই সাথে সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি যেমন হাতুড়ি বাটালের ব্যবহার করতে জানে তবে সেই প্রজাতি বিজ্ঞান, যান্ত্রিক প্রযুক্তি এবং পরবর্তীতে বেতার প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হবেই। বৈজ্ঞানিক কোন আবিষ্কার ঘটবার পর পরই এটি এতোই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যে তা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। কোন কোন সমাজ হয়তো আদিম চাকা পর্যায়ে আটকে যেতে পারে, কিন্তু মাত্র একজন বিজ্ঞানীই হয়তো সেই অবস্থা থেকে উত্তোরণ ঘটিয়ে দিতে পারেন। যেমন করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল ১৮৬৪ সালে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের মিথস্ক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে। এরপর মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই অসংখ্য ব্যক্তি আদিম ধরনের বেতার যন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন। দুই প্রজন্ম পরেই ড্রেক এমন একটি বেতার ডিশ ব্যবহার করেছেন যা কয়েক আলোকবর্ষ দূরের সঙ্কেত গ্রহণ করতে সক্ষম ছিল। কাজেই $F_c$-এর মান আগের মতোই একশ শতাংশের কাছাকাছি বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

## L-ঐ সমস্ত সভ্যতার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল

মহাবিশ্বে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নেওয়া সত্ত্বে যদি প্রযুক্তিগত সভ্যতাগুলো নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলে তবে আমরা তাদেরকে খুঁজে পাবো না। ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে অনেক গবেষকই দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন এই ভেবে যে প্রযুক্তিগত সভ্যতার আয়ুষ্কাল হয়তো অস্বাভাবিক রকমের স্বল্প দৈর্ঘ্যের- মাত্র শ' দুয়েক বছর বা তারও কম। বেতার প্রযুক্তি উদ্ভবের দক্ষতার জন্য যে ধরনের সময়ের প্রয়োজন তা পারমানবিক প্রযুক্তির দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের প্রায় কাছাকাছি। কাজেই বিজ্ঞানীদের যুক্তি ছিল যে, বেতার সম্প্রচার শুরু করার পরপরই হয়তো আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ব্যবহৃত পারমানবিক অস্ত্রে কারণে সেই সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

আত্মধ্বংস ছাড়াও স্রেফ প্রাকৃতিক কারণেও কোন সভ্যতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। যেমন, এটি হতে পারে কাছাকাছি কোন নক্ষত্রে সুপারনোভা বিস্ফোরণের কারণে। এ ধরণের

সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটে কোন কোন তারার একেবারে 'মরণ দশায়', যখন তারাটি তার সমস্ত জ্বালানী একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। এদের অনেকগুলোই তখন আভ্যন্তরীণ প্রচন্ড মহাকর্ষের চাপ আর বিপরীতমুখী তাপীয় চাপের টানা-পড়েন সইতে না পেরে নিজের বাইরের খোল-নলচে উপরে ফেলে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায় আর মহাকাশে প্রচন্ড শক্তি নির্গত করে। সে শক্তির এমনই তেজ যে শত সহস্র আলোক বর্ষ দূরের গ্রহ থেকেও আলোর ঝলকানি টের পাওয়া যায়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান কেপলার এমনি এক সুপারনোভা বিস্ফোরণ দেখেছিলেন ১৬০৪ সালের ৯ ই অক্টোবর, যেটি ঘটেছিল পৃথিবী থেকে ২০ হাজার আলোক বর্ষ দূরের কোন এক নক্ষত্রে (চিত্র : ৮.২)। ওই নক্ষত্রটি যদি এত দূরে না থেকে পৃথিবীর কাছাকাছি থাকত তবে তবে পৃথিবীর 'জীবন লীলা' যে তখনই সাঙ্গ হত তা বলাই বাহুল্য। কাজেই মহাবিশ্বের কোথাও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটলেও তার কাছাকাছি সুপারনোভা বিস্ফোরণ কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে তা বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে আমাদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ করার আগেই।



**চিত্র ৮.২:** সুপারনোভা এসএন ১৬০৪ এর ভগ্নাবশেষের ছবি (চন্দ্র এক্স রে মানমন্দির থেকে প্রাপ্ত)

গত দশকে এই হতাশাজনক চিন্তাভাবনার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে কোন দূরবর্তী গ্রহে গণবিলুপ্তি ঘটলেও প্রাণের বিকাশ পুরোপুরি রুদ্ধ নাও হতে পারে, কিংবা পুনর্বার সেখানে প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। যেমন, আমাদের পৃথিবীতেই চার থেকে সাড়ে চার কোটি বছর আগে যে গণবিলুপ্তির ঘটনা ঘটেছিল, যাকে 'অর্ডোভিসিয়ান-সিলুরিয়ান এক্সটিংকশন' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তার পেছনে সম্ভবতঃ সুপারনোভা বিস্ফোরণই ছিল দায়ী। তারপরও দেখা গেছে গণবিলুপ্তির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পন না করে সর্বংসহা পৃথিবী প্রাণে প্রাণে স্পন্দিত হয়েছে পুনর্বার।

আবার প্রাযুক্তিক অগ্রগতির অনিবার্যতাকে যদি মানুষের মত কোন উন্নত সভ্যতা আত্মধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তা হলেও সে গ্রহে কিছু প্রজাতি, বিশেষ করে 'নিম্ন প্রজাতির' অণুজীবেরা টিকে থাকতে পারে। এরপর কি সে গ্রহে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আবারো আরেক বুদ্ধিমান প্রজাতির অভ্যুদয় ঘটবে? এটা জানার কোন উপায় নেই। তবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটি অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আমরা জানি জুরাসিক যুগে ডায়নোসরেরা অন্য প্রাণীদের তুলনায় জৈবিকভাবে অনেক অগ্রসর ছিল। তারপরও পৃথিবীর বুকে এক বিশাল উল্কাপাতের ফলে আজ থেকে সাড়ে ছ' কোটি বছর আগে তারা সার্বিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সে সময় টিকে ছিল কিছু তুচ্ছ স্তন্যপায়ী প্রাণী। সেই স্তন্যপায়ী জীবদের থেকেই সাড়ে ছ'কোটি বছরের বিবর্তনের ফল আমরা- আজকের মানুষেরা। আজকের মানুষেরা যদি এ মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়, হয়ত আরো সাড়ে ছ' কোটি বছর পর এ ধরণীতে আরেক বুদ্ধিমান প্রজাতির অভিব্যক্তি ঘটবে। তারাও যদি কোন আন্তঃ কলহ, পারমানবিক যুদ্ধ কিংবা স্টার ওয়ারের ভিতর দিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আরো সাড়ে ছ' কোটি বছর পর আরো এক বুদ্ধিমান এবং উন্নত সভ্যতার উদ্ভব হতে পারে। এবং এই প্রক্রিয়া হয়ত অব্যাহত থাকবে। সূর্যের মত মাঝারি গোছের নক্ষত্রের আয়ু ধরা হয় পাঁচশ কোটি বছর। আর বুদ্ধিমান প্রজাতির বিলুপ্তি আর অভ্যুদয়ের প্রতিটি পর্ব যদি সাড়ে ছয় কোটি বছর হয়, তবে ওই পাঁচশ কোটি বছরে সাতাত্তর বার বুদ্ধিমান প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে। এটি একটি সুযোগ বটে, পৃথিবীর জন্য, এবং মহাকাশের অন্যান্য গ্রহের জন্যও। হয়ত এমনও হতে পারে, সর্বশেষ বুদ্ধিমান প্রজাতিটি তাদের পুর্ববর্তী 'বুদ্ধিমান' প্রজাতিগুলোর নির্বুদ্ধিতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আত্মধ্বংস পরিহার করার উপায় বের করে ফেলবে, নিজেদের সভ্যতাকে মহাকাশের অন্য নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করে ফেলবে।

আত্মধ্বংস ছাড়াও বিজ্ঞানীদের উপর ভিন্ন ধরনের অন্য এক দঃশ্চিন্তা এসে ভর করেছে। বর্তমানকালে টেলিভিশন সম্প্রচারের জায়গা অতি দ্রুত দখল করে নিচ্ছে ফাইবার অপটিক কেবল এবং সরাসরি সম্প্রচারের স্যাটেলাইট। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো পৃথিবীতে আর কোন বেতার সঙ্কেত থকবে না। এই ধরনের প্রযুক্তিগত বিবর্তন ভিনগ্রহের সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে $L$ এর মান ছোট হতে বাধ্য। প্রযুক্তিগত সভ্যতার আত্মধ্বংস বা যোগাযোগের মাধ্যমের উন্নতির ফলে বেতার-প্রযুক্তিগত যোগাযোগ নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া সম্ভব, তা সে যে কোন কারণেই হোক না কেন। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত মানব সভ্যতার মাত্র গত ষাট বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা। নাটকীয়ভাবে এই পরিস্থিতি পালটেও যেতে পারে। যখন কোন প্রযুক্তিগত সভ্যতা রকেট আবিষ্কার করে তখন সেই সভ্যতা আশে পাশের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করবে এটা ধরে নেওয়াই স্বাভাবিক। আর এর জন্য তারা হয়তো

তৈরি করবে তাদের সৌরজগত বিস্তৃত GPS, যা থেকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরিত হবে বেতার সঙ্কেত।

ড্রেক L-এর মান নির্ধারণ করেছিলে ১০,০০০ বছর। অন্যেরা কেউ এর মান ধরেছেন ড্রেকের চেয়ে অনেক কম, আবার কেউ কেউ এর মান ধরেছেন ড্রেকের চেয়ে অনেক বেশি। এটাই এই সমীকরণের একমাত্র রাশি যেখানে অনুমান করা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

**N: এবং উত্তর হচ্ছে ..........**

ড্রেক এবং তার অনুগামীরা যখন তাদের সর্বোত্তম অনুমানগূলো সমীকরণে প্রয়োগ করেছিলেন তখন এর মান বের হয়েছিল কয়েক হাজার। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব এতোই স্বাভাবিক যে পৃথিবী থেকে একহাজার আলোকবর্ষ দূরেই ভিনগ্রহের সভ্যতা থাকার কথা।

ড্রেক এবং তার অনুগামীদেরকে ভবিষ্যত বক্তা হিসাবে আখ্যায়িত করলেও খুব একটা ভুল হবে না। বর্তমান সময়ের সমস্ত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী ড্রেকের সমীকরণ এখনো শক্ত ভিতের উপর দাড়িয়ে আছে। ড্রেক নিজেই বলেন, 'আমাদের ওই সময়কার অনেক অনুমানই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে।'

অবশ্য এর বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারতো। জোতির্বিজ্ঞানীরা হয়তো আবিস্কার করতে পারতেন যে, এই মহাবিশ্বে গ্রহ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, অথবা প্রাণের বিকাশের মত উপযোগী অঞ্চল খুবই কম। কিন্তু তার পরিবর্তে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের ক্রম অগ্রসরমান জ্ঞান ড্রেকের সমীকরণের যথার্থতাই শুধু প্রমাণই করছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা একে ছাড়িয়েও যাচ্ছে। যার কারণে গত ছেচল্লিশ বছরের ফলাফলহীন সন্ধানের পরও অনেক বিজ্ঞানীই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে এই বিপুল মহাবিশ্বে আমরা হয়তো একা নই।

মাইকেল ক্রিসটন (Michael Christon) ড্রেকের সমীকরণকে 'ফালতু' হিসাবে আখ্যায়িত করেছিলেন। যেহেতু ড্রেকের সমীকরণ পরীক্ষা করা যায় না কাজেই এটি বিজ্ঞান নয় বলে তিনি দাবী করেন। তার মতে, ড্রেকের সমীকরণ বিজ্ঞানের নামে 'ক্ষতিকর আবর্জনা' তৈরির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

যেহেতু ড্রেকের সমীকরণে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মানগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাই করা সম্ভবপর নয়, কাজেই ড্রেকের সমীকরণের উত্তরও মোটামুটি অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে ক্রিচটনের এই সমীকরণকে একেবারেই ‘ফালতু’ বলাটা পুরোপুরি ঠিক হয়নি। ড্রেকের সমীকরণ বিভিন্ন সমস্যাগুলো কিভাবে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কযুক্ত তাই ব্যাখ্যা করে, এদের সংখ্যাগত মান আমরা জানি কিনা সেটা মুখ্য বিষয় নয়। জোতির্বিজ্ঞানীরা খুব ভাল করেই জানেন যে, ড্রেকের সমীকরণ কোন কিছুই এই মুহূর্তে হাতে নাতে প্রমাণ করতে পারে না। এই সমীকরণকে তারা দেখে থাকেন জটিল কোন বিষয়কে খন্ড খন্ড অংশে ভেঙ্গে সমাধানের উপায় হিসাবে। এ ধরনের বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক চিন্তার জগতে হরহামেশাই হচ্ছে। নতুন পর্যবেক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনে ড্রেকের সমীকরণকে পরিবর্তন করা যেতে পারে বা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপনও করা যেতে পারে। তবে বিষয়টির সুত্রপাত হিসাবে এই সমীকরণের ভূমিকা কিন্তু থেকেই যাবে।

প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে আমরা জানি, এরিস্টারকাস (Aristarchus) সর্বপ্রথম সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব (Helicentric View) এবং ডেমোক্রিটাস (Democritus) বস্তুর ‘পারমানবিক তত্ত্ব’ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাদের এই ধারণা পরীক্ষা করা তাদের পক্ষে বা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সেই সময় ক্রিচটনের মতো কিছু ব্যক্তিও নিশ্চয়ই ছিল যারা ওই সমস্ত ধারণাকে ক্ষতিকর হিসাবে মত  দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু এই ধারণাগুলো নীরবে শতাব্দীর পর শতাব্দী অপেক্ষা করে থেকেছে কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওকে অনুপ্রাণিত করার জন্য। আধুনিক এটমিক থিওরীর পথিকৃৎ এই বিজ্ঞানীরা প্রাচীন সেই ধারণাগুলো পরীক্ষা করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হয়তো কয়েক শতাব্দী লেগে যেতে পারে কিন্তু একদিন যে ড্রেকের সমীকরণ এবং এর সকল উপাদান পরীক্ষনযোগ্য (Testable) হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

## ফার্মির  গোলকধাঁধা : তারা সবাই কোথায়?

ড্রেকের আগেও অনেকেই মহাজাগতিক সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন বিখ্যাত পদার্থিবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি (Enrico Fermi)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় ফার্মি কাটিয়েছেন লস অ্যালামস-এ ম্যানহাটন প্রজেক্টে পারমানবিক বোমা তৈরিতে সাহায্য করার জন্য। তবে সব খারাপ দিকেরই আবার দু’ একটি ভাল দিক থাকে। মানব বিধ্বংসী এই প্রজেক্টের সবচেয়ে ‘আলোকিত’ দিক ছিল যে, সভ্যতার কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কিছ সংখ্যক অসম্ভব প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বেশ কিছুটা অবসর সময় পেয়েছিলেন। এই অবসর সময়কে তারা কাজে লাগিয়েছেন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায়। এরকমই এক আলোচনায় লাঞ্চ টেবিলে ফার্মি যুগান্তকারী এক মন্তব্য করেন যা নিয়ে এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনার কমতি নেই।

ফার্মি চিন্তা করে দেখলেন যে, আমাদের এই মহাবিশ্বে যদি অসংখ্য সভ্যতা থাকে তাদের অনেকেরই হাজারখানেক বছরের মধ্যেই আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণে পারদর্শী হয়ে উঠবার কথা। আলোর গতিতে না চলুক, তার চেয়ে অনেক কম গতিসম্পন্ন (যেমন, আলোর বেগের এক থেকে দশ শতাংশ বেগে) যানবাহনে করেই এই আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ সম্ভব। আর সেক্ষেত্রে আরো বেশী কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন সভ্যতারই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পুরো গ্যালাক্সী দখল করে নেওয়ার কথা। ৩৭.৫ লক্ষ বছরের মধ্যেই  বছরের মধ্যেই প্রতিটি নক্ষত্রজগত সেই সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যাওয়ার কথা (চিত্র ৮.৩)। কিন্তু আমাদের চারপাশে এ ঘটনার কোন প্রমাণ আমরা দেখতে পাইনা। ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ফার্মি প্রশ্ন ছুড়ে দেন যে, 'তারা কোথায়?' (Where are they?) এটাই ফার্মি প্যারাডক্স (Fermi Paradox) বা ফার্মির গোলকধাঁধা নামে বিখ্যাত।

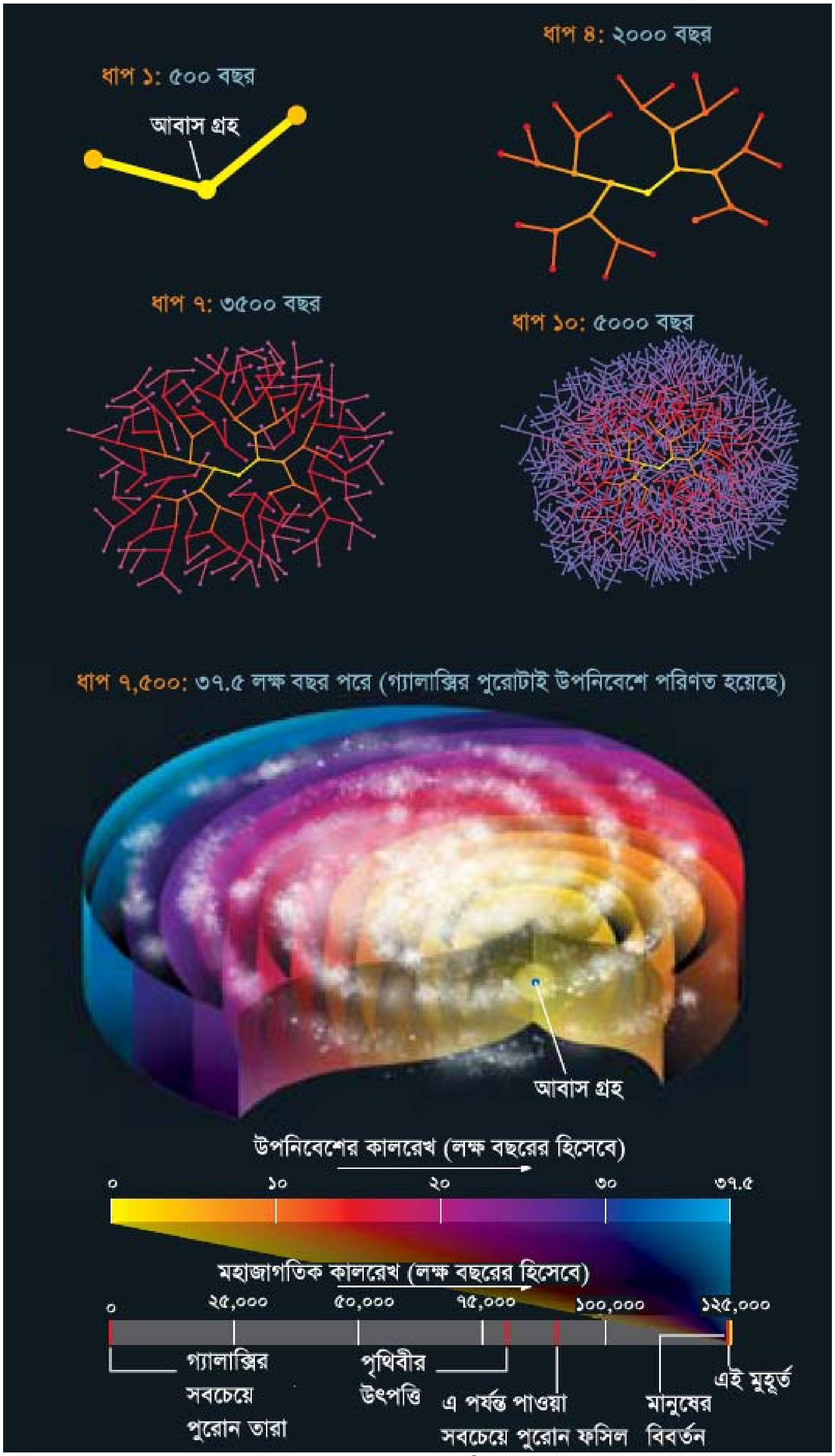
ফার্মির গোলকধাঁধার প্রত্যুত্তর হিসেবে এখন পর্যন্ত অসংখ্য সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন, ইংল্যান্ডের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন ওয়েব নিজেই গোটা পঞ্চাশেক সমাধানকে আলোচনায় এনেছেন (Webb, 2002)। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে এর সবগুলো নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়; আমরা প্রধাণ কয়েকটি নিয়ে এখানে আলোচনা করবো।

## হয়ত মহাজাগতিক সভ্যতা বলে কিছু নেই

ফার্মি প্যারাডক্সের সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, এই মহাবিশ্বে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। বুদ্ধিমান প্রাণীসত্তা এই মহাবিশ্বে কেন অপ্রতুল বা স্বল্পস্থায়ী যে বিষয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে।

যারা বিশ্বাস করেন যে, আমরা ছাড়া অন্য কোন বুদ্ধিমান প্রাণী এই মহাবিশ্বে নেই, তারা যুক্তি দেন যে প্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বা জটিল জীবন উদ্ভব খুবই দুর্লভ বা বলা যেতে পারে পৃথিবীতেই শুধুমাত্র ঘটেছে। একে বলা হয় 'বিরল পৃথিবী অনুকল্প' (Rare Earth Hypothesis)। পৃথিবীতে প্রাণ বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একটাই প্রজাতি মহাকাশযান কিংবা বেতার প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়টিকে সামনে এনে এর প্রবক্তারা যুক্তি দেন যে প্রযুক্তিগত সভ্যতা মহাবিশ্বে বিরল হতে বাধ্য।

এ বিষয়ে অন্য একটি যুক্তি হচ্ছে যে, মহাবিশ্বে প্রাণ বিকাশের পরিবেশ হয়তো সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু জীবন তৈরি হওয়া, জটিল অণুসমুহের একই সাথে সমপ্রতিরূপ তৈরি করা,




**চিত্র ৮.৩:** মহাজাগতিক উপনিবেশ: কোন বুদ্ধিমান প্রাণী ৩৭.৫ লক্ষ বছরের মধ্যে তাদের পুরো গ্যালাক্সি অধিকার করে নিতে পারে।

এমনভাবে শক্তি গ্রহণ করা যাতে রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ ঘটানো সম্ভব ইত্যাকার বিষয় সমূহ প্রাণের জন্য প্রাক-পরিবেশ বিদ্যমানকারী গ্রহে নাও ঘটতে পারে।

অন্য একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, প্রাণ হয়তো প্রতি মুহূর্তেই মহাবিশ্বের সর্বত্র তৈরি হচ্ছে, কিন্তু বরফ যুগ বা অন্য কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ জটিল প্রাণ বিকাশে বাধা দিচ্ছে। প্রাণ বিকাশের পরিবেশ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকার না হলেও এই সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি মুহূর্তে ঘটে সেই সমস্ত গ্রহে প্রাণকে ধ্বংস করে দিয়েছে বা দিচ্ছে।

## মহাজাগতিক সভ্যতা আছে তবে....

প্রযুক্তিগত সভ্যতা হয়তো এই মহাবিশ্বে আছে তবে তারা এতো দূরে যে কার্যকর কোন যোগাযোগ তাদের সাথে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। দু'টো সভ্যতা যদি কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত হয় তবে এটা খুবই সম্ভব যে, তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করার আগেই নিজেরাই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। মানবীয় অনুসন্ধানে তাদেরকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তবে দূরত্বের কারণে যোগাযোগ করাটা আসলেই অসম্ভব হয়ে থাকবে।

অন্য একটি সম্ভাবনা হচ্ছে যে যেহেতু আন্তঃনক্ষত্রিক পরিভ্রমণ খুবই ব্যয়বহুল কাজেই কোন মহাজাগতিক সভ্যতাই উপনিবেশ তৈরির ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয়। আন্তঃনাক্ষত্রিক ভ্রমণ প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব, এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই মহাজাগতিক সভ্যতার বিভিন্ন নক্ষত্রজগতে উপনিবেশ তৈরির অনুমানসমূহ গড়ে উঠেছে। যদিও পদার্থবিজ্ঞানের বর্তমান সূত্রসমূহ আলোর চেয়ে গতিশীল কোন মহাকাশযানের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়, কিন্তু এর চেয়ে কম গতিশীল নভোযান পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই লংঘন না করে তৈরি করা সম্ভব। অবশ্য এটা সম্ভব যে, আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আন্তঃনাক্ষত্রিক উপনিবেশ গড়ার সম্ভাবনা এবং ব্যয় সম্পর্কে এখনো পর্যাপ্ত নয়।

১৯৩৭ সালে বেতার টেলিস্কোপ আবিষ্কারকে বিভক্তি রেখা হিসাবে ধরলে মানুষের বহির্জাগতিক সভ্যতার অস্তিত্ব সনাক্ত করার সময়সীমা কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়। ভূতাত্ত্বিকভাবেও এই পৃথিবীতে মানুষের আগমন খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে দুই লাখ বছর আগে। মাত্র দুই লাখ বছর মহাজগতিক সময়ের মাপকাঠিতে একেবারেই নগণ্য। কাজেই এটা সম্ভব যে মানুষ খুব বেশি দিন আগে থেকে অনুসন্ধান শুরু করে নি এবং মহাজাগতিক সভ্যতার নজরে পড়ার মতো খুব বেশি দিন আগেও এই ধরায় আগমন ঘটেনি।

কৃত্রিম বেতার তরঙ্গ পৃথিবী থেকে বিচ্ছুরিত হওয়া শুরু হয়েছে ১৮৯৫ সালে পপভ (Popov), মার্কনি (Markoni) এবং টেলসা (Telsa) প্রথম বেতার সম্প্রচার শুরু করার পর থেকে। এর মানে হচ্ছে এখন পর্যন্ত মাত্র ৫৫ আলোকবর্ষ দূরের কোন সভ্যতার পক্ষেই শুধুমাত্র পৃথিবী থেকে পাঠানো বেতার সঙ্কেত রিসিভ করে আবার প্রতি উত্তর পাঠানো সম্ভব। অথবা এমনও হতে পারে প্রথম দিকের সঙ্কেতগুলো এতোই দূর্বল ছিল যে সেগূলোকে সনাক্ত করাও সম্ভব নয়। ১৯৫৭ সালের পর থেকে মহাকাশ যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে যে বেতার সঙ্কেতগুলো পাঠানো হয়েছে সেগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল বিধায় সনাক্ত করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মাত্র ২৪ আলোকবর্ষ দূরের মহাজাগতিক সভ্যতাই মানুষের যোগাযোগের আওতায় আছে। সময়ের সাথে সাথে এই যোগাযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কিংবা এমন হতে পারে আমাদের গ্রাহক যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট উন্নত নয় বিধায় আমরা তাদের সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারছি না।

## পৃথিবীকে ইচ্ছা করেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে (The Zoo Hypothesis)

মহাজাগতিক সভ্যতা মানুষের সাথে যোগাযোগ করবে এই বিশ্বাস একধরনের ভ্রমাত্মক যুক্তি বা হেত্বাভাস (Fallacy) হতে পারে। যোগাযোগের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মহাজাগতিক সভ্যতা যোগাযোগের জন্য ইচ্ছুক নাও হতে পারে। মহাজাগতিক উন্নত সভ্যতা হয়তো তাদের গবেষণার জন্য আমাদেরকে চিড়িয়াখানার মত আলাদা করে রেখেছে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধার্থে। কিংবা তারা হয়ত কোন 'গ্যালাক্টিক আইন' মেনে চলে যা পৃথিবীতে বা অন্য কোন গ্রহে উদ্ভুত প্রাণের স্বাধীন বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করার বিরুদ্ধে। এটা নীতিগত (মানব সভ্যতাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য) বা কৌশলগত (মহাজাগতিক সভ্যতা হয়তো চিহ্নিত হতে চায় না অন্য কোন সভ্যতার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভয়ে) কারণে হতে পারে।

যদি পৃথিবী থেকে যোগাযোগের সীমানায় একটি মাত্র সভ্যতা থাকে বা সমভাবাপন্ন সভ্যতাসমূহ থাকে অথবা যদি এমন কোন আইন বিভিন্ন সভ্যতাসমূহের মধ্যে থাকে যে পৃথিবীকে আলাদা করে রাখবে সেক্ষত্রেই 'জু হাইপোথেসিস' বেশ কার্যকর। কিন্তু যদি এই মহাবিশ্বে একাধিক মহাজাগতিক সভ্যতা থেকে থাকে তবে এই অনুকল্পকে পুরোপুরি ব্যর্থ বলা যেতে পারে।

## মহাজাগতিক অন্তরীণ অনুকল্প (Cosmic Quarantine Hypothesis)

১৯৮১ সালে ফার্মি প্যারাডক্সের সমাধান হিসাবে মহাকাশ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড হ্যারিসন (Edward Harrision) শক্তিশালী আত্ম-নিয়ন্ত্রণ মেকানিজমের কথা উল্লেখ করেন। অন্য গ্রহে

ব্যাপক উপনিবেশ গড়ে তোলার আগ্রহী সভ্যতা অঞ্চল বৃদ্ধিকারক তাড়না দিয়ে তাড়িত হবে। কিন্তু আন্তঃনক্ষত্রিক পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যে বিপুল পরিমান প্রযুক্তিগত ক্ষমতার প্রয়োজন তা এই আগ্রাসী আচরণকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। ফলশ্রুতিতে, ভিন্ন নক্ষত্রে পৌঁছানোর অনেক আগেই ওই ধরনের সভ্যতা নিজেদেরকে ধ্বংস করে তুলবে।

অদম্য অঞ্চল বিকাশের তাড়না যা একসময় লক্ষ লক্ষ বছরের জৈবিক বিবর্তনবাদে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, সেটাই একসময় দায় হয়ে দাড়িয়েছে প্রজাতির উপর যখন কোন প্রজাতি তার আত্ম-ধংসের চেয়ে বেশি ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে। মিল্কিওয়ে ছায়াপথে হয়তো আমাদের চেয়েও অনেক বুদ্ধিমান সভ্যতা থাকতে পারে, কিন্তু তাদেরকেও অবশ্যই আমাদের মতো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুনির মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে।

তারপরও, ধরা যাক কোন একটা সভ্যতা আত্ম-ধ্বংস এড়িয়ে উপনিবেশ গঠন শুরু করে দিল। সেক্ষেত্রে সমস্ত সৌরজগতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ার কথা। কিন্তু হ্যারিসন আত্ম-নিয়ন্ত্রনের মেকানিজম ব্যর্থ হলেও অন্য একটা মেকানিজম এর কথা উল্লেখ করেছেন যা এই ক্ষেত্রে কাজ করতে এগিয়ে আসবে। হ্যারিসন মতে, এ ধরনের কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিকশিত সভ্যতা তা খেয়াল করবে এবং এ ধরনের প্রচেষ্টাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেবে।

## উড়ন্ত চাকী (UFO)

উপরের অনুকল্পগুলো ছাড়াও ফার্মির গোলক ধাঁধার আরো অনেক সমাধান থাকতে পারে। 'তারা সবাই কোথায়?' ফার্মির এ প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তর অনেকে ভাবেন বিভিন্ন সময় আকাশে দেখা ওই রহস্যময় উড়ন্ত চাকী বা ইউএফও (UFO) গুলোকে। সাধারণ মানুষ কল্পণাপ্রবণ : তারা ভাবেন মহাজাগতিক প্রাণীরা আমাদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য নিয়ম করে পৃথিবীর আকাশে চক্কর খাচ্ছে! উড়ন্ত চাকী বা ইউএফওগুলো তারই নমুনা। ইউএফও গুলোকে আকাশে দেখেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, অনেকে আবার এমন দাবীও করেছেন যে, তাদের কাউকে কাউকে মহাজাগতিক প্রাণীরা করায়ত্ব করে তাদের মহাকাশযানে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষায় অধিকাংশ দাবীগুলোরই অসারতা প্রমাণিত হয়। এর পেছনে কারণ হিসেবে মহাকাশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, মতিভ্রম, প্রচারের আলোয় আসার প্রবণতা, গন-সম্মোহন, হ্যালুশিনেশন কিংবা স্রেফ মিথ্যাচার বা জোচ্চুরীকে উল্লেখ করা যায়।

আকাশের যে সব বস্তুকে উড়ন্ত চাকী ভেবে প্রায়শঃই ভুল করা হয় সেগুলোর একটি তালিকা করেছিলেন আমেরিকার জ্যোতির্বিদ ডোনাল্ড মেনজেল; তাদের মধ্যে আছে : বিচিত্র

চেহারার বিমান, অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় দুর্ঘটনা কবলিত বিমান, কৃত্রিম উপগ্রহ, পাখির ঝাঁক, মেঘের স্তর থেকে প্রতিফলিত সার্চলাইটের আলো, উজ্জ্বল কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত সূর্যের আলো, প্রতিপ্রভ প্রাণীদেহ, উল্কা, শুক্রের মত উজ্জ্বল গ্রহ, উজ্জ্বল নক্ষত্র, মেরুজ্যোতি এবং আরো কিছু বস্তু। কোলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের প্রধান এডওয়ার্ড ইউ কনডন ২১ বছর ধরে এউএফও'র উপর গবেষণা করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে : '২১ বছরের গবেষণায় এমন কিছুই বেরিয়ে আসেনি যা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে ত্বরান্বিত করেছে। ভবিষ্যতের আরো গবেষণাও যে কোন আলো দেখাবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই।' আমেরিকার বিমান বাহিনীর 'প্রোজেক্ট ব্লু বুক' রিপোর্টেও বলা হয়েছে 'আমাদের ২২ বছরের অনুসন্ধানে ইউএফও সংক্রান্ত রিপোর্টগুলোর একটিকেও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে হয়নি।'

তারপরেও কিন্তু মানুষের প্রত্যাশা কখনই থমকে থাকে নি, সেজন্যই কার্ল স্যাগান আর ড্রেকের মত স্বাপ্নিকেরা গবেষণা চলিয়ে গেছেন বহির্জাগতিক প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণের প্রত্যাশায়, এক আন্তঃনাক্ষত্রিক সংস্কৃতির সন্ধানে। মহাবিশ্বে প্রাণ-সন্ধানী বিজ্ঞানী ব্রুস জ্যাকোস্কি মনে করেন, যে বিল্পবের সূচনা একদিন কোপার্নিকাস করেছিলেন পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিয়ে, আর ডারউইন এগিয়ে দিয়েছিলেন বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে মানবজাতিকে শিম্পাঞ্জীকূলের কাছাকাছি ঠেলে দিয়ে, সে অসমাপ্ত বিপ্লবই পূর্ণতা পাবে মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলে। কোপার্নিকাস যেমন প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী কোন বিশিষ্ট গ্রহ নয়, কিংবা ডারউইন যেমন বুঝেছিলেন মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোন 'বিশেষ সৃষ্টি' নয়, তেমনি মহাবিশ্বের আর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলে বোঝা যাবে যে, পৃথিবীতে প্রাণের অভ্যুদয়ও কোন বিশেষ ঘটনা নয়, বরং মহাজগতের বিভিন্ন এলোপাথারি ঘটনার মধ্যে ঘটে যাওয়া স্রেফ এক প্রাকৃতিক অনিবার্যতা। কে জানে, হয়ত বিজ্ঞানীদের স্বপ্নকে সত্যি প্রমাণ করে মানব সভ্যতা একদিন পৌঁছে যাবে আন্তঃনাক্ষত্রিক সভ্যতার মিলন মেলায়, পূর্ণতা পাবে কোপার্নিকাসের 'অসমাপ্ত বিপ্লব'। কবে সেটা? কয়ক'শ কিংবা কয়েক হাজার বছরে? নাকি তারও বেশী? আমরা কেউ তা জানি না। আপনি বা আমি কেউ হয়ত বেঁচে থাকব না সে সময়, বেঁচে রবে আমাদের স্বপ্ন তখন।

অক্টোবর ২৫, ২০০৬

{অষ্টম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

পরবর্তী পর্ব দ্রষ্টব্য...

# মহাজাগতিক ঠিকানার খোঁজে

## (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে –শেষ পর্ব)

ফরিদ আহমেদ

পূর্ববর্তী পর্বের পর...

*If atom stocks are inexhaustible,*
*Greater than power of living things to count,*
*If Nature's same creative power were present too*
*To throw the atoms into unions-exactly as united now,*
*Why then confess you must*
*That other world exists in other regions of the sky,*
*And different tribes of men, kinds of wild beasts.*

– Lucretius

### সেটি (SETI): মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার সন্ধানে

বহির্বিশ্বে মহাজাগতিক সভ্যতা আছে কিনা তা যাচাই করার সহজ পন্থা হিসাবে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা বেতার সঙ্কেতকে বেছে নেন। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী গুইসেপ ককোনি (Giuseppe Cocconi) এবং ফিলিপ মরিসন (Philip Morrison) ১৯৫৯ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞান সাময়িকী 'Nature'-এ 'Searching for Intersteller Communications' নামে একটি গবেষণাপত্রে মত প্রকাশ করেন যে, বেতার তরঙ্গ হতে পারে মহাবিশ্বে বিভিন্ন সভ্যতার যোগাযোগের সবচেয়ে কার্যকর পন্থা এবং ফলশ্রুতিতে মহাজাগতিক সভ্যতা চিহ্নিত করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিজ্ঞানীদ্বয় এর জন্য ১ থেকে ১০ গিগাহার্জ বেতার তরঙ্গ, বিশেষ করে ১.৪২ গিগাহার্জের বেতার তরঙ্গের কথা উল্লেখ করেন। কারণ নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন থেকে এই ফ্রিকোয়েন্সী নির্গত হয় এবং এই ফ্রিকোয়েন্সীরই ক্ষমতা আছে মিল্কিওয়ে ছায়াপথের ঘন মেঘের আস্তরণ ভেদ করে যাওয়ার। আমাদের মতো ভিন গ্রহের সভ্যতারাও বেতার তরঙ্গ সম্প্রচার করতে পারে। কাজেই তারা যুক্তি দেন যে আমাদের বেতার দূরবীক্ষণগুলোরও উচিত ওই সমস্ত সঙ্কেতগুলো খুঁজে দেখা । যদিও তারা এ বিষয়ে সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারেননি, কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে যদি আমরা কখনোই অনুসন্ধান না চালাই তবে সেক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা একেবারে শূন্যই থেকে যাবে।

ককোনি এবং মরিসনের প্রবন্ধই মুলতঃ *সেটির* সুত্রপাতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে অতি শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক মহল পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব খোঁজার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে নেন।

তবে এ ধরণের  গবেষণার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কোন ফ্রিকোয়েন্সীতে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে হবে তা খুঁজে বের করা। যেহেতু, মহাজাগতিক বুদ্ধিমান প্রাণী কোন ফ্রিকোয়েন্সী গ্রহণ করতে পারবে তা জানা নেই সেই হেতু মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন মাত্রার ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করতে হয়।

বেতার সঙ্কেত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা বিদ্যমান। আমরা আদৌই জানি না কি গ্রহণ করতে হবে, কেননা মহাজাগতিক প্রাণীরা কিভাবে সঙ্কেত প্রেরণ করবে বা তাদের প্রেরিত তথ্য কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

তিরিশের দশকের শেষের দিকে ইলিনয়ের হুইটন শহরে বেতার ইঞ্জিনিয়ার গ্রোট রবার্ট (Grote Robert) তার বাড়ির পিছনের আঙ্গিনায় ডিশ আকৃতির একটি বেতার এন্টেনা তৈরি করেন। রবার্ট তার একত্রিশ ফুট ব্যাসের বেতার এন্টেনা মিল্কিওয়ে ছায়াপথের দিকে তাক করে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু থেকে বেতার সঙ্কেত ভেসে আসছে। রবার্টের এই এন্টেনাই ছিল বিশ্বের প্রথম বেতার দূরবীক্ষণ।

বেতার দূরবীক্ষণকে বলা হয় 'জোতির্বিদদের কান', যদিও ঠিক প্রচলিতভাবে আমরা যেভাবে বেতার শুনি জোতির্বিদরা ঠিক সেভাবে বেতার সঙ্কেত শোনেন না। একটি বেতার দূরবীক্ষণের কমপক্ষে একটি ডিশ আকৃতির এন্টেনা আছে যা মহাশূন্য থেকে প্রাপ্ত বেতার তরঙ্গ সংগ্রহ করে। এই সঙ্কেতগুলোকে পাঠানো হয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে, সেখানে কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বস্তু থেকে বেতার সঙ্কেত এসেছে তার চিত্রও তৈরি করা হয়।

অপটিক্যাল দূরবীক্ষণের তুলনায় বেতার দূরবীক্ষণে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা আছে। বেতার তরঙ্গ অপটিক্যাল তরঙ্গের তুলনায় মহাশূন্যের অনেক গভীরে যেতে পারে এবং কি রোদ কি বৃষ্টি দিন রাত চব্বিশ ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা এগুলো মেঘ ভেদ করে যেতে পারে। মহাকাশের বস্তুসমূহ দিনের বেলাতেও বেতার তরঙ্গ বিকিরণ করে থাকে। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমেই আবিষ্কার করা হয়েছে মহাকাশের অনেক কোয়াসার এবং পালসার।

তবে মহাকাশের বস্তুসমূহই একমাত্র বেতার তরঙ্গের উৎস নয়।  ১৮৯৫ সালে মার্কনী বেতার আবিষ্কার করার পর থেকে এই পৃথিবীর মানুষেরাও বেতার তরঙ্গ  ট্রানসমিট করে চলেছে।

১৯২৯ সাল থেকে আমরা টেলিভিশন সম্প্রচার করা শুরু করেছি যাও একধরনের বেতার তরঙ্গ। AM বেতার তরঙ্গ আমাদের বায়ুমন্ডলে ধাক্কা লেগে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে, কিন্তু *এফএম* বেতার তরঙ্গ আলোর গতিতে চিরকালের জন্য মহাশূন্যে ধাবিত হয়। পৃথিবীর টেলিভিশন সম্প্রচারে *এফএম* বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

দূরবর্তী কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহ থেকে কেউ বেতার দূরবীক্ষণ নিয়ে বসে থাকলে তারপক্ষে আমাদের পৃথিবী থেকে আগত বেতার সঙ্কেত চিহ্নিত করা সম্ভব। তবে সেটা কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আমরা এফ এম বেতার এবং টিভি সঙ্কেত গত ৭৫ বছর ধরে ব্যবহার করছি, কাজেই সেই গ্রহকে হতে হবে পৃথিবী থেকে ৭৫ আলোকবর্ষের ভিতরে। এছাড়া সঙ্কেত যেহেতু কয়েক বিলিয়ন ফ্রিকোয়েন্সিতে পাঠানো সম্ভব, কাজেই শ্রোতাদেরকেও সঠিক চ্যানেল বা স্টেশনে টিউন করতে হবে। যদি এই মুহূর্তে চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহ থেকে কেউ তাদের দূরবীক্ষণ পৃথিবীর দিকে সঠিক ফ্রিকোয়েন্সীতে তাক করে রাখে তাহলে তারা আমাদের ১৯৬৬ সালের বেতার এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুনতে বা দেখতে পারবে।

ফ্রাঙ্ক ড্রেক সর্বপ্রথম *সেটি প্রকল্প* চালু করেন ১৯৬০ সালে, যার নাম ছিল 'প্রজেক্ট ওজমা' (Project Ozma)। ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাংকের ন্যাশনাল বেতার এস্ট্রোনমী অবজার্ভেটরী থেকে প্রজেক্ট ওজমা ২৮ মিটার বেতার দূরবীক্ষণের সাহায্যে ১৫০ ঘন্টা ধরে ১৪২০ মেগা ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট সঙ্কেত শোনার চেষ্টা করে। সুর্যের অনুরূপ মাত্র দু'টো নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়, টাউ সেটি (Tau Ceti) এবং এপসিলন এরিডানি (Epsilon Eridani)। কিন্তু ড্রেক কোন মহাজাগতিক সভ্যতার সঙ্কেতের হদিস দিতে সমর্থ হননি। ১৯৭০-৭২ সালের মধ্যে পালমার ও জুকারম্যান 'প্রোজেক্ট ওজমা'-এর মাধ্যমে ৬৭৪টি নক্ষত্রকে অনুসন্ধান করেন। ১৯৭১ সালের এক গ্রীষ্মে দূরবর্তী নক্ষত্রমন্ডল গুলোতে বুদ্ধিমান সভ্যতা থাকার সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য নাসা এবং আমেরিকান সোসাইটি ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন, চব্বিশজন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সমাবেশ ঘটায়। 'প্রোজেক্ট সাইক্লোপস' নামে অভিহিত আলোচনাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বহির্জাগতিক বুদ্ধিমত্তা অনুসন্ধানের প্রযুক্তি আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই। কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য কয়েকশ ডলার খরচ হবে। সাফল্য হয়ত কয়েক দশকের মধ্যে আসতে পারে। সাইক্লোপস প্রকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১০০ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ১৫'শ বেতার দূরবীক্ষণ বসানোর। কিন্তু অর্থায়নের অভাবে এটি শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি।

ওজমা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের সেটি প্রজেক্টের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে এগুলো একবারে মাত্র একটি করে চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করতে পারতো। আশির দশকের প্রথম দিকে হার্ভাডের পদার্থিবিজ্ঞানের প্রফেসর পল হরোউইজ (Paul Horowitz) 'সুটকেস সেটি' আবিষ্কার করেন

যা একসাথে ১২৮,০০০ চ্যানেল স্ক্যান করতে সক্ষম এবং যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অনায়াসে সরিয়ে নিয়ে জুড়ে দেওয়া যেতে পারতো যে কোন বেতার দূরবীক্ষণের সাথে।

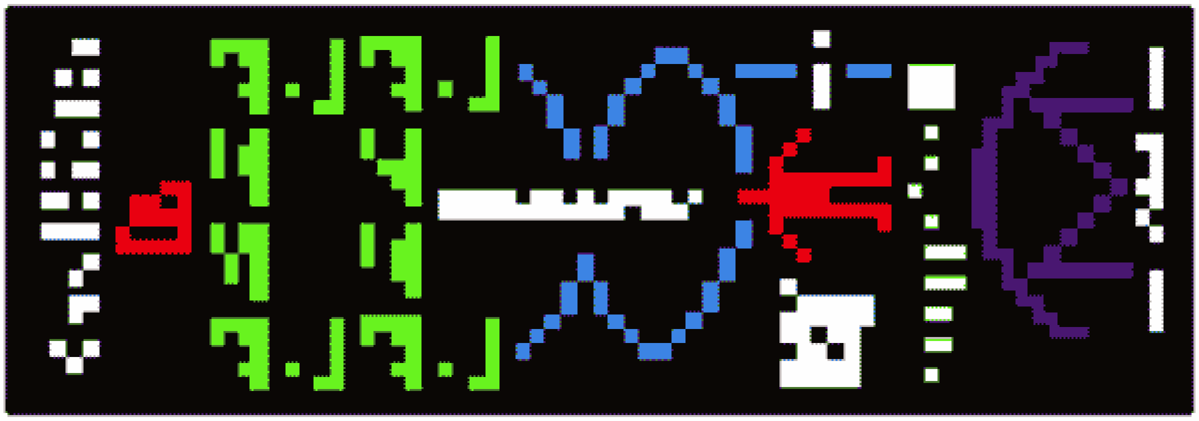
১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম পুয়ের্টোরিকোর আরেসিবোতে (Arecibo) অবস্থিত বিশালাকৃতির ট্রান্সমিটার থেকে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিমান প্রাণীদের উদ্দেশ্যে গভীর মহাশূন্যে বেতার বার্তা পাঠানো হয়। ০ এবং ১-কে ব্যবহার করে সৌরজগতে আমাদের অবস্থানসহ আরো কয়েকটি তথ্য পুরে দেওয়া হয় এতে। বার্তাটি পৃথিবী থেকে ছাব্বিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরের মহাশূন্যের এম১৩ নামে পরিচিত অসংখ্য নক্ষত্রে পরিপূর্ণ একটি ঘিঞ্জি এলাকার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা যেহেতু এম১৩ অঞ্চল হাজার হাজার নক্ষত্রে পরিপূর্ণ কাজেই সেখানে মহাজাগতিক কোন সভ্যতা থাকতেও পারে যারা হয়তো অধীর আগ্রহে বেতার দূরবীক্ষণ নিয়ে বসে আছে আমাদের বার্তার প্রতীক্ষায়।



**চিত্র ৯.১ :** পুয়ের্টোরিকোর আরেসিবোতে (Arecibo) অবস্থিত বিশালাকৃতির ট্রানসমিটার

এম১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠাতে প্রায় ১০ মিনিট সময় লেগেছিল। এই বার্তার মধ্যে উপাত্ত বিন্দুর (data point) সংখ্যা ছিল ১৬৭৯টি। এই সংখ্যাটি নির্বাচন করা হয়েছিল কারণ, এটা শুধু ২৩ ও ৭৩ এর গুণফল হতে পারে। যখন এই সংকেত এম১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের যে সভ্যতার কাছে পৌঁছুবে তারা এটাকে মাত্র দু'ভাবে সাজাতে পারবে। একটি হল ২৩টি সারি যার ৭৩ টি উপাত্ত বিন্দু থাকবে। কিন্তু এই বিন্যাসের কোন অর্থ হবে না। অপর বিন্যাসটি অর্থাৎ ৭৩টি সারি ও ২৩ টি বিন্দু একটি ছবি তৈরি করবে যা বর্ণনা করে আমাদের সৌরজগৎ, মানব গঠনের রাসায়নিক ভিত্তি, মানুষের সাধারণ আকৃতি ও মানুষের সংখ্যাকে। এই বার্তা যদি বুদ্ধিমান প্রাণীরা পায় তার উত্তর আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌছুতে ৫২

হাজার বছর সময় লেগে যাবে। ততদিন কি মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে? যদি নাও থাকে তারপরও এই বেতারবার্তা মানবজাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছে অনাগত স্বপ্নিল ভবিষ্যতের।



**চিত্র ৯.২ :** ১৯৭৪ সালে ২৬ হাজার আলোকবর্ষ দূরে হারকিউলিসের এম১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা এই বেতারবার্তা পাঠিয়েছেন।

১৯৮২ সালে ডঃ হরোউইজ তার *সুটকেস সেটি* জুড়ে দেন পুয়ের্টো রিকোর (Puerto Rico) আরেসিবো মানমন্দিরের (Arecibo Observatory) সুবিশাল বেতার দূরবীক্ষণের সাথে। ৭৫ ঘন্টা ধরে সুর্যের মতো ২৫০ টি নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করে বুদ্ধিমান প্রাণীর পাঠানো বেতার সঙ্কেত খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। ড্রেকের মতোই তিনিও কিছুই খুঁজে পাননি। অবশ্য এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, মিল্কিওয়ে ছায়াপথে ২৫০ টা নক্ষত্র সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু কণা মাত্র।

*সুটকেস সেটি*-র পর হরোউইজ তৈরি করেন META (Megachannel Extraterrestrial Assay) নামের একটি গ্রাহক যন্ত্র যা একসঙ্গে ৮.৪ মিলিয়ন চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ১৯৮৫ সালে META ৮৪ ফুটের হার্ভাড ইউনিভার্সিটি/স্মিথসোনিয়ান বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে বোস্টন থেকে মহাজাগতিক সংকেত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা শুরু করে। অন্যান্য *সেটি* প্রজেক্টগুলোও নতুন নতুন গ্রাহক যন্ত্র আবিষ্কার করে যেগুলো কয়েক হাজার থেকে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত চ্যানেল একসাথে বিশ্লেষণ করতে পারে।

নব্বই দশকের শুরুর মধ্যেই প্রায় দশটা দেশে ষাটেরও বেশি সংখ্যক *সেটি* অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। যদিও কোন বহির্জাগতিক সংকেত পাওয়া যায়নি তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আশাবাদী রয়েছেন। তাদের মতে, হয়তো একটিমাত্র সংকেত পাওয়ার জন্য কয়েক দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে তা সত্ত্বেও ভবিষ্যত যে উজ্জল সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত ছিলেন, কেননা NASA তখন কয়েকটি বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে বড় ধরনের একটি *সেটি* প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছিল।

ষাট এবং সত্তুরের দশকে নাসা *সেটি* কর্মকান্ডে হাল্কাভাবে জড়িত ছিল। ১৯৯২ সালে নাসা আনুষ্ঠানিকভাবে *সেটি* কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু পরবর্তী বছরেই কংগ্রেস এই কার্যক্রম বাতিল করে দেয়। NASA-র *সেটি* প্রকল্প ১২ মিলিয়ন ডলারের বাজেট নিয়ে শুরু হয় ১৯৯২ সালে, কিন্তু এই উচ্ছাসে বাধা আসে পরের বছরই। বাজেট সংকোচনের কারণে কংগ্রেস ১৯৯৩ সালে *সেটি* প্রকল্প থেকে আর্থিক অনুদান প্রত্যাহার করে নেয়। এর পর থেকে যত বড় ধরনের *সেটি* প্রকল্প চলেছে তার সবগুলোরই অর্থসংস্থান এসেছে মূলতঃ ব্যক্তিগত অনুদানের ভিত্তিতে।

NASA-র *সেটি* কার্যক্রমের ধবংসস্তুপ থেকে গড়ে উঠেছিল সান ফ্রান্সিসকো ভিত্তিক *সেটি* ইনস্টিটিউট-এর প্রজেক্ট ফিনিক্স (Project Phoenix)। নাসার *সেটি* প্রকল্প বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বহু সংখ্যক নাসার প্রাক্তন বিজ্ঞানীরা ফ্রাঙ্ক ড্রেকের নেতৃত্বে *সেটি* ইনস্টিটিউটের প্রজেক্ট ফিনিক্সে যোগ দেন। প্রজেক্ট ফিনিক্স বেতার সিগন্যালের বাইরেও Drake Equation-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন। NASA-র *সেটি* প্রকল্প শেষ হওয়ার আগে এর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছিলেন এমন একটা গ্রাহক যন্ত্র যা ২৮ মিলিয়ন চ্যানেল একই সময়ে মনিটর করতে পারে। প্রায় হাজার খানেক সুনির্দিষ্ট নক্ষত্রের উপর অনুসন্ধান চালানোর জন্য প্রজেক্ট ফিনিক্স এই গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করেছে।

*সেটি* ইনস্টিটিউট-এর জোতির্বিদ সেথ সোস্টাক (Sheth Shostak)। *সেটি* প্রকল্প কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ

> ‘প্রাথমিক ভাবে জ্যোতির্বিদরা তাদের বেতার দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে কেবল পৃথিবীর কাছাকাছি নক্ষত্রেই অনুসন্ধান চালাবেন। এভাবে বেতার দূরবীনগুলো সমস্ত দিক থেকে মহাজাগতিক উপাত্ত সংগ্রহ করবে। কম্পিউটারের মাধ্যমে তখন উপাত্তগুলোকে বিভিন্ন চ্যানেলে ভাগ করে দেওয়া হবে। যেহেতু *সেটি* গবেষকেরা একসাথে সবগুলো চ্যানেলের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারেন না, সেহেতু অন্য একটি কম্পিউটার এই তদারকিতে সাহায্য করবে; এটি বিদঘুটে ধরণের কোন সংকেত পেলেই সেটি ‘বিপ্’, ‘বিপ্’ শব্দ করে গবেষকদের তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবে। সে ক্ষেত্রে কম্পিউটারটি থেকে উঁচু-নীচু পাহাড়ের ঢালের মত তরঙ্গাকারে সংকেত উৎপন্ন হতে থাকবে। যদি একটি সংকেত অন্যগুলোর চেয়ে উঁচুমানের হয়, তার মানে দাঁড়াবে সে সংকেতটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া সঙ্কেতের চেয়ে অনেক শক্তিশালী অর্থাৎ সঙ্কেতটি বর্হিজাগতিক সংকেত হওয়ার দাবীদার। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষণে যদি দেখা যায় যে, সঙ্কেতগুলো কোন এক পার্থিব টিভি স্টেশনের

> বা যন্ত্রের কাছে রাখা মাইক্রো-ওভেনের ব্যতিচারের কারণে সৃষ্ট হয়েছে, তবে তা নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যাবে।’

১৯৭৯ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের *সেটি* প্রকল্প হিসাবে ‘Search for Extraterrestrial Radio from Nearby Developed populations (SERENDIP)’-এর কার্যক্রম শুরু হয়। *সেটি* ইনস্টিটিউট বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের বেতার এস্ট্রোনমি ল্যাবের সহযোগিতায় *সেটি* গবেষণার জন্য বিশেষ এক ধরনের দূরবীক্ষণ ATP (Allen Telescope Array) উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই দূরবীক্ষণ দিয়ে ‘Multibeaming’ নামক এক ধরনের কৌশলের মাধ্যমে একই সাথে অসংখ্য পর্যবেক্ষণ অবলোকন করা সম্ভবপর।

বার্কলের আরেকটি চমকপ্রদ উদ্যোগ হচ্ছে SETI@home যা শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। এটা এমন একটি প্রকল্প যেখানে যে কেউই ইচ্ছা করলেই ঘরে বসে এই প্রজেক্টে কাজ করতে পারবে। এর জন্য প্রয়োজন শুধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি ছোট্ট প্রোগ্রাম ডাউনলোড করা। যেহেতু বেতার দূরবীক্ষণ বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক উপাত্ত সংগ্রহ করে, কাজেই বিজ্ঞানীদের এই বিপুল সংখ্যক উপাত্তকে বিশ্লেষণ করতে হয় ভিনগ্রহের সভ্যতার সঙ্কেত কিনা তা যাচাই করার জন্য। কোন একক কম্পিউটারের পক্ষেই এতো ব্যাপক পরিমান তথ্য সামলানো সম্ভব নয়। কাজেই বার্কলের বিজ্ঞানী ড্যান ওয়ার্দিমার (Dan Werthimer) এবং ডেভিড এন্ডারসন (David Anderson) কয়েক মিলিয়ন কম্পিউটারকে এই কাজে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ওয়ার্দিমার এমন একটি সফটওয়ার তৈরি করেন যা ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কম্পিউটার অবসরকালীন সময়ে সঙ্কেত অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকবে। ফলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কাজে কোন বিঘ্ন ঘটবে না। কিন্তু কফি ব্রেকের সময় বা রাতের বেলায় এটি মূল গ্রাহক যন্ত্র থেকে বিপুল সংখ্যক উপাত্ত ডাউনলোড করবে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করবে। শতাধিক দেশের পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই প্রোগ্রামের সাথে বর্তমানে জড়িত রয়েছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ব্যাপী *সেটি* প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালে ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির ‘বৃহৎ কর্ণ’ (Big Ear) বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে। বিগ ইয়ার *সেটি* প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ডঃ রবার্ট এস ডিক্সন (Robert S. Dixon)-এর মতে *সেটি* অনুসন্ধান দুই ধরনের মহাজাগতিক সংকেত চিহ্নিত করতে পারে। একটি বেতার দূরবীক্ষণ হয়তো কোন একটি সভ্যতার অভ্যন্তরীণ *এফএম* বেতার টেলিভিশন সম্প্রচারের বেতার সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের সঙ্কেতকে বলা হয় নিঃসরণ (Leakage) এবং এর অনুসন্ধানকে বলা হয় আড়িপাতা (Evesdropping)। আরেকধরনের সঙ্কেত হতে পারে যা হয়তো কোন সভ্যতা পরিকল্পিতভাবে পাঠাচ্ছে এই আশায় যে আমরা সেই সংকেত গ্রহণ করবো। যেহেতু

এই সংকেতের মাধ্যমে কোন সভ্যতা তার অস্তিত্ব জাহির করছে তাই এই ধরনের সঙ্কেতকে বলা হয় বাতিঘর (Beakon)। ডঃ ডিক্সন বলেন যে, 'দুই ধরনের সংকেতই গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু বাতিঘরকে চিহ্নিত করা সহজতর হবে এই জন্য যে এটা অন্য সংকেতের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার কথা।'

শক্তিশালী হওয়া ছাড়াও অন্য একটি কারণে বাতিঘরকে চিহ্নিত করা সহজ হতে পারে। যোগাযোগের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য, মহাজাগতিক সভ্যতা ম্যাজিক ফ্রিকোয়েন্সিতে সংকেত পাঠাতে পারে। এই ম্যাজিক ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ১.৪ গিগাহার্জ (নিরপেক্ষ হাইড্রোজেনের ফ্রিকোয়েন্সি, যা মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিমানে বিদ্যমান) এবং ১.৭ গিগাহার্জ (হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমাহারে তৈরি হাইড্রোক্সিলের ফ্রিকোয়েন্সি)।

*সেটি* প্রকল্পগুলো মাঝে মাঝে যে সংকেত পায়নি তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু সংকেত মাত্র একবার পাওয়ার পরই আর কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এধরনের সঙ্কেতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত সঙ্কেত হচ্ছে 'WOW signal' যা এসেছিল মিল্কিওয়ে ছায়াপথের মধ্যবর্তী আঞ্চলের একটি নক্ষত্র থেকে। ১৯৭৭ সালে 'বৃহৎ কর্ণ' এই সংকেত গ্রহণ করে। কর্মরত প্রকৌশলী সে সময় উত্তেজিত হয়ে চার্টের মধ্যে WOW লিখে ফেলেছিল আর সেখান থেকেই এই সঙ্কেতের নাম হয়ে যায় WOW সঙ্কেত। মহাজাগতিক সভ্যতার সঙ্কেত হিসাবে এটি একটি উদাহরণ হতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এটা আসার সাথে সাথেই আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ডিক্সন বলেন, 'মনে হল যেন কেউ হঠাৎ করে সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে। হতে পারে এটি কোন অতি গোপনীয় কোন সামরিক স্যাটেলাইটের অজানা কোন ফ্রিকোয়েন্সি, অথবা কোন বহির্জাগতিক সভ্যতার সঙ্কেত বা কোন ভিন গ্রহবাসীদের মহাকাশযান। আমরা হয়তো কোনদিনই জানতে পারবো না।'

ডঃ ডিক্সন ব্যাখ্যা দেন এভাবে যে, আমরা কখনোই দাবি করতে চাই না যে আমরা মহাজাগতিক প্রাণীর সাথে যোগাযোগ করেছি যা পরে ভুল প্রমানিত হোক। কাজেই *সেটি* অনুসন্ধানে জড়িত প্রত্যেকেই একটি *সেটি* সনাক্তকরণ বিধি-তে (SETI detection protocol) সই করেছে। আমরা যদি কখনো অচেনা কোন সঙ্কেত পাই যা মনে হতে পারে ভিন গ্রহ থেকে এসেছে, প্রথম কাজ আমরা যেটা করবো তা হচ্ছে খুব ভাল করে যাচাই করে দেখবো যে যন্ত্রপাতির কোন সমস্যা আছে কিনা। তারপর অন্যান্য *সেটি* অনুসন্ধান কেন্দ্রে খোঁজ নেওয়া হবে যে তারা একই ধরনের কোন সঙ্কেত পেয়েছে কিনা।

পল হরোউইজ তার ৮.৪ মিলিয়ন চ্যানেল META অনুসন্ধান প্রকল্প প্রায় দশ বছর ধরে চালিয়ে যান। এরমধ্যে মহাকাশ অভিযান এবং *সেটি* গবেষণায় আগ্রহী একটি দল প্লানেটারী সোসাইটির আর্থিক সহযোগিতায় তৈরি করেন তার Billion-Channel Extraterrestrial

Assay (BETA)- যা দুই বিলিয়ন বেতার চ্যানেল পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম ছিল। ১৯৯৫ সালে BETA কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময় ডঃ হরোউইজ বলেন, 'এটা ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেলে টিউন করা বহু লক্ষ বেতারযন্ত্র একসাথে আপনার ডেস্কে থাকার মত ব্যাপার।'

*সেটি* অনুসন্ধানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান মনুষ্য-সৃষ্ট বেতার ফ্রিকোয়েন্সী। এগুলো এই অনুসন্ধানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেল ফোন, পুলিশ র‍্যাডার, বা বিমান চলাচলের যোগাযোগ যন্ত্রগুলো প্রতি মুহূর্তে তৈরি করে চলেছে অসংখ্য বেতার ফ্রিকোয়েন্সী। এছাড়া পৃথিবীতে অবস্থিত বেতার দূরবীক্ষণ পৃথিবীর মাত্র এক অর্ধাংশ মহাকাশের সঙ্কেত গ্রহণ করতে পারে।

*সেটি* বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা চিন্তা ভাবনা করেছেন। বেতার ফ্রিকোয়েন্সির বিঘ্ন এড়ানোর জন্য চাঁদের অপর পৃষ্ঠে একটি *সেটি* পর্যবেক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। অবশ্য এতে করে পৃথিবীর মতোই চাঁদও মহাকাশের অর্ধেককে ঢেকে রাখবে। অন্য একটি চিন্তা হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথে *সেটি* বেতার দূরবীক্ষণ স্থাপন করা। এতে করে যেমন মানব সৃষ্ট বেতার ফ্রিকোয়েন্সীর হাত থেকে বাঁচা যাবে, তেমনিভাবে একই সাথে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়ায় সম্পূর্ণ মহাকাশকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

আরেসিবো মানমন্দিরের আশাবাদী বিজ্ঞানী মাইক ডেভিস বলেন যে, 'হয়তো দেখা যেতে পারে যে সারা মহাবিশ্বে জীবন কিলবিল করছে এবং প্রতিটি নক্ষত্র থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীরা সঙ্কেত পাঠাচ্ছে।' মাইক ডেভিস এবং তার বেশিরভাগ সহকর্মীরা মনে করেন যে আমরা একদিন না একদিন বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে পাবো। অবশ্য এর বিপরীত সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

## বিজ্ঞান নাকি অপবিজ্ঞান?

অনেক বিজ্ঞানীই আছেন যারা মনে করেন যে, *সেটি* প্রকৃত বিজ্ঞান নয় বরং অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞান (Pseudoscience)। তাদের এহেন ধারণার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ভুল প্রমাণেয়তা (falsifiability) যার মাধ্যমে কার্ল পপার (Karl Popper) বিজ্ঞান এবং অপ-বিজ্ঞানের পার্থক্যের মানদন্ড করেছেন অত্যন্ত সুস্পষ্ঠভাবে। পপারের মতে, যুগে যুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নয় বরং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গুলোর ভ্রান্তি প্রমাণের মধ্য দিয়ে : 'the criterion of *the scientific status of a theory is*

*its falsifiability*, *or refutability*, *or testability*'। এটাই হওয়া উচিৎ বিজ্ঞানের ছাঁকুনি। আর এই ছাঁকুনি চালনার জন্য দরকার নিগূঢ় পরীক্ষণের। পপারের ভাষায়,

> 'বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তত্ত্বগুলোকে কঠিন প্রায়োগিক পরীক্ষণের (empirical testing) মধ্যে দিয়ে চালানো যাবে। যখন কোন তত্ত্বকে পরীক্ষণের চেয়ে বরং সুরক্ষিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন বুঝতে হবে এর মধ্যে গলদ রয়েছে।'

এই মানদন্ড অনুযায়ী *সেটি* কোনক্রমেই প্রকৃত বিজ্ঞান নয়, কারণ এতে ভুল প্রমাণেয়তার (falsifiability) অভাব রয়েছে। *সেটি* পরীক্ষণের ইতিবাচক ফলাফল সবিস্তারে বিভিন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে কিন্তু এই পরীক্ষণের সংজ্ঞায়িত ব্যর্থতার শর্তসমূহ কি তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হচ্ছে না। ১৮৫৩ সালে বহির্জাগতিক প্রাণ অনুসন্ধানের এক মূখ্য চরিত্র উইলিয়াম ওয়েহেল মন্তব্য করেছিলেন, 'যে (এলিয়েন সংক্রান্ত) বিতর্কে আজ আমরা নিয়োজিত তা বিজ্ঞানের রাজ্যের এমন এক প্রান্তসীমায় রয়েছে যেখানে জ্ঞানের শেষ আর অজ্ঞতার শুরু'।

কার্ল স্যাগানও তার বহুল বিক্রিত গ্রন্থ 'The Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark' -এ ভুল প্রমাণেয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । তিনি যুক্তি (argument) যাচাই এবং ভ্রান্ত ও খুঁতযুক্ত যুক্তি উদঘাটনের জন্য বেশ কিছু উপায়ও বাতলে দেন যা Baloney Detection Kit নামে পরিচিত, বাংলায় আমরা এর নামকরণ করতে পারি -'মিথ্যা নির্ণায়ক যন্ত্র' হিসেবে। । এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেঃ

ক) কর্তৃপক্ষ বা 'গুরু'র যুক্তি খুব সামান্যই গুরুত্ব পাবে (বিজ্ঞানে এ ধরনের কোন 'গুরু'র অস্তিত্ব নেই)।

খ) অক্কামের ক্ষুর (Occam's razor)- যদি একই ধরনের দুটি অনুকল্প উপাত্তকে সমানভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে তবে এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিকে গ্রহণ করতে হবে।

গ) দেখতে হবে অনুকল্পটিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা সম্ভব কিনা। অন্য কথায় হাইপোথেসিস পরীক্ষণযোগ্য কিনা। অন্যরা একই ধরনের পরীক্ষা করলে সম ধরনের ফলাফল পাবে কিনা-এটি হতে হবে বিবেচ্য বিষয়।

মজার বিষয় হচ্ছে, স্যাগানকেই তার প্রদত্ত প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণার নির্দেশনা ভংঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। স্যাগান নিজে কর্তৃপক্ষ হয়েও *সেটি* গবেষণার পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সকল উপাত্তই রায় দিয়েছে যে, আমাদের ছায়াপথে এখনো কোন বুদ্ধিসত্ত্বার পরিচয় মেলেনি। ফলে *সেটি* এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে যা এখনো পর্যন্ত 'বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়' হয়ে ওঠার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি।

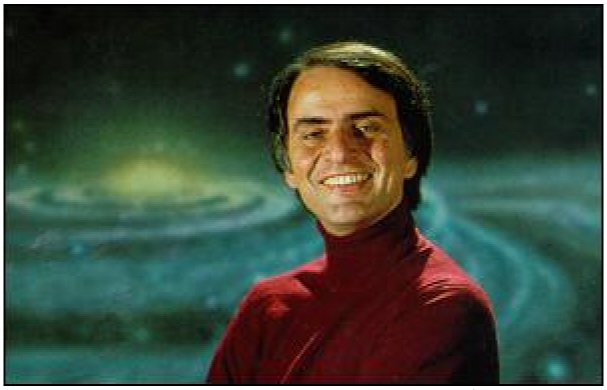
*সেটি* সমর্থকরা অবশ্য এই সমালোচনাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন এই বলে যে, মূলধারার কোন বিজ্ঞানীই আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের দাবী করেননি। বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে বা থাকার সম্ভাবনা আছে এমন কথাই শুধু বলা হয়েছে মাত্র, আর সে সম্ভাবনার নিরিখেই চলছে তাদের 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান'।

## মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তার অনুসন্ধান : এক বর্ণাঢ্য জুয়াখেলা

মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের জগতের সবচেয়ে বড় জুয়াখেলা। কেউই জানে না এই গবেষণার ফলাফল কি হবে। হয়তো এই মহাবিশ্ব প্রাণশূন্য, আমরা ছাড়া আর কোন প্রাণীর অস্তিত্বই হয়তো নেই কোথাও। আমরা যদি *সেটি* অনুসন্ধান চালিয়ে যাই এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে থাকি যেমন দিন দিন যদি চ্যানেল সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে হয়তো একদিন আমরা বর্তমানের চেয়ে আরো দক্ষ অনুসন্ধান চালাতে পারবো। কয়েক শত বছর পরেও যদি দেখা যায় যে কোন সঙ্কেতই পাওয়া যাচ্ছে না, তা হলে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে যে এই মহাবিশ্বে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান সত্তা। তবে সেই আবিষ্কারও মহাজাগতিক প্রাণী আবিষ্কারের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে এই মহাবিশ্বে পৃথিবী নামক আমাদের এই প্রিয় গ্রহটি অনন্য সাধারণ এবং সেই সাথে জীবনও মহাবিশ্বে দুর্লভ কাজেই এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আমাদেরই কর্তব্য। এখন পর্যন্ত অনন্ত মহাবিশ্বের মাত্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে পরিচালনা করা হয়েছে অনুসন্ধান। বিশাল মহাবিশ্বের প্রায় পুরোটাই বলা যায় রয়ে গেছে মানুষের বোধ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে কি আছে আর কি নেই, সে সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই অপ্রতুল।

অনেকে আবার বলছেন এতো অর্থ অপচয় করে বহির্জাগতিক সভ্যতার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করার আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? আর তা ছাড়া সে সমস্ত সভ্যতা যদি আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত আর শক্তিশালী হয় তবে তারা আমাদের খোঁজ পেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এই ধরনের অভিযোগের উত্তরে কার্ল স্যাগান বলতেন, একটি উন্নত সভ্যতা থেকে আমরা যদি কোন বার্তা সত্যই পাই তাহলে দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির মতো 'পরশ পাথর' খুঁজে

পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বিশাল। কিন্তু এই সুবিধা নির্ভর করছে প্রাপ্ত বার্তা কতো বিস্তারিত হবে তার উপর। এ সম্পর্কে আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। অবশ্য এই বার্তা পেলে একটি বিষয় স্পষ্ট হবে যে, উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব রয়েছে এবং ওই সভ্যতা আত্মধ্বংস এড়িয়ে যাওয়ার মতো কৌশলও রপ্ত করে ফেলেছে।



**চিত্র ৯.৩ :** কার্ল স্যাগান : যিনি স্বপ্ন দেখতেন এই মানব সভ্যতা একদিন পৌঁছে যাবে আন্তঃনাক্ষত্রিক মিলনমেলায়।

যে আত্মধ্বংস আমাদের মত প্রযুক্তিগতভাবে স্বল্প উন্নত সভ্যতার জন্য সমূহ বিপদ বলে মনে হয়, এবং যে বিপদের ভিতর আমরা প্রতিনিয়ত অবস্থান করছি : বিশ্বায়নের ফলে শক্তিশালী জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, জাতি-উপজাতিগুলোর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ বিগ্রহ, পরিবেশ দূষণ, সব কিছুর ঢালাও বাণিজ্যিকরণ, ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি। এই ধরনের আন্তঃ নাক্ষত্রিক বার্তা হয়ত আমাদের জন্য এমন একটি বাস্তব সুবিধা এনে দিতে পারে যাকে গণিত শাস্ত্রের ভাষায় বলে অস্তিত্বের তত্ত্ব (Existence theorem)। এর অর্থ হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি করায়ত্ব করেও আমরা হয়ত আত্ম ধ্বংসের পথ পরিহার করার উপায় সম্বন্ধে জানতে পারব এবং শান্তির সাথে বসবাস করতে পারব। আর খরচের কথা উঠলে এ কথা তো অবশ্যই বলা যায় যে, আধুনিক একটি যুদ্ধ জাহাজ যেমন ডেস্ট্রয়ার তৈরি করার খরচ দিয়ে বহির্জাগতিক প্রাণ অনুসন্ধানের খরচ অন্ততঃ দশ বছর চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। এই গবেষণায় অর্থ ব্যয় করা দরকার শুধুমাত্র এই আশায় যে, সত্যিই যদি সাফল্য অর্জন করা যায় তবে তা হবে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সাফল্য অর্জন না করলেও খুব একটা সমস্যা নেই, কেননা এই গবেষণার ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তির যে অবিশ্বাস্য উন্নতি হচ্ছে তার সুফলও ভোগ করবে শেষ পর্যন্ত মানুষই।

## মানুষের মহাজাগতিক ঠিকানা: দ্বিতীয় পৃথিবীর সন্ধানে

আরেকটি কারণেও এই ধরণের মহাজাগতিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রযুক্তিভিত্তিক সভ্যতা এখন পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ব্যবহার্য শক্তি আহরণের উপর।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে পৃথিবীর অব্যবহৃত শক্তির উৎস কমে আসছে, এমন একদিন আসবে যখন পৃথিবীতে ব্যবহার উপযোগি কোন শক্তিই হয়ত আর পাওয়া যাবে না। জীবাশ্ম জ্বালানীর মজুদ যাবে ফুরিয়ে। তখন আমাদের উত্তরসূরীদের হাত বাড়াতে হবে মহাজাগতিক সামগ্রিক উৎসের দিকে। পৃথিবীতে ব্যবহার্য শক্তির প্রধানতম উৎস হল সূর্য। চারশ কোটি বছর পার করে দিয়ে আজও সূর্য যেন 'প্রেটি ইয়ং', শক্তির এক 'অফুরন্ত ভান্ডার' যেন! কিন্তু তারপরও সূর্য কিন্তু চিরঞ্জীব নয়। বিজ্ঞানীরা সূর্যের মত কম ভরের একটি মাঝারি মানের* নক্ষত্রের মৃত্যুর চুড়ান্ত সময় নির্ধারণ করেছেন : আর সেটি এখন থেকে পাঁচশ কোটি বছরের মধ্যে। নক্ষত্র সৃষ্টির প্রথম যুগে ভর আর তাপমাত্রা যখন যথেষ্ট বেশি থাকে, তখন খুব বেশি বেগ সম্পন্ন হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। এটি ঘটে 'ত্রি-ধাপীয় তাপ-নিউক্লিয় ফিউশন' প্রক্রিয়ায়, যা 'হাইড্রোজেন দহন' নামে পরিচিত। এই হাইড্রোজেন দহনই আমাদের শক্তির মূল উৎস। কিন্তু আগামী পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যে 'সোলার কোর'-এর সমস্ত হাইড্রোজেন ফুরিয়ে যাবে। এরপর সূর্য প্রসারিত হয়ে একটি 'ক্ষুদ্র দৈত্যে' পরিণত হবে। নামে ক্ষুদ্র হলেও এর আকৃতি হবে বর্তমান সূর্যের প্রায় তিনগুণ আর এর উজ্জ্বলতা হবে এখনকার উজ্জ্বলতার প্রায় দ্বিগুণ। সঙ্গত কারণেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। ফলে, সমুদ্রের সমস্ত পানি তখন বাষ্পে পরিণত হবে। এ সময় যদি কোন প্রাণীকে টিকে থাকতে হয়, তবে অস্বাভাবিক উচ্চ তাপমাত্রাকে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হবে। পরবর্তী কয়েকশ কোটি বছরের মধ্যে সূর্য পরিণত হবে 'লোহিত দৈত্যে'। তখন সূর্যের ব্যাস হবে বর্তমান ব্যাসের শতগুণ, আর উজ্জ্বলতা হাজারগুণেরও বেশি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে লোহিত দৈত্যে পরিণত হওয়ার পূর্বেই হিলিয়াম গ্যাসের স্ফুরণ ঘটবে। হিলিয়াম পোড়ার এই কাল হবে কয়েক কোটি বছর। হিলিয়াম পোড়ার শুরু থেকে সূর্য কিছুটা সঙ্কুচিত হলেও শেষ দশ লক্ষ বছরে সূর্য আবার প্রসারিত হতে থাকবে। এর তাপমাত্রা তখন দাড়াবে কয়েক হাজার কেলভিন, আর এর উজ্জ্বলতা বর্তমান উজ্জ্বলতার কয়েক হাজার গুণ। এরপর সূর্য তার বহির্স্তর ত্যাগ করবে, এর ফলে সূর্যের বহিররাবরণ থেকে উৎক্ষিপ্ত উপাদান নিয়ে 'প্ল্যানেটরি নেবুলা' তৈরি হতে পারে। তখনও যদি পৃথিবী ধ্বংস্প্রাপ্ত না হয়, তবে এর পোড়া পৃষ্ঠদেশ হবে গাঢ় অন্ধকার এবং শীতল। স্বভাবতই এটি হবে প্রাণহীন ও শুস্ক। সাদা বামনে বিবর্ণ রূপ ধারণ করবে আমাদের আজকের মহাপ্রতাপশালী নক্ষত্র সূর্য।

স্বভাবতই সূর্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার অবলুপ্তিকে অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। নিঃসন্দেহে যে কোন 'নৈরাজ্যজনক পরিণতি'কে অতিক্রম করাই বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। সেজন্যই মানুষ হাজারো পার্থিব সমস্যার মধ্যে থেকেও আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণের স্বপ্ন দেখে, যদিও এ প্রযুক্তি শৈশবও অতিক্রম করেনি। কিন্তু যত দিন যাবে এ

* 'মাঝারি মানের' বলা হল এ কারণে যে, সূর্যের মত গড়নের তারা আমাদের গ্যালাক্সি আকাশগঙ্গাতেই রয়েছে কয়েকশ কোটি। আবার কয়েকশ কোটি তারা রয়েছে যারা আমাদের সূর্য থেকেও অনেকগুণ বড় এবং উজ্জ্বল। সূর্য থেকে কম উজ্জ্বল তারার সংখ্যা তা থেকেও শতাধিক গুণ বেশি হবে।

প্রযুক্তি তত পরিণত হবে, এটি আশা করা যায়। এ ধরনের গবেষণায় রাষ্ট্রীয় বাজেট উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমনকি পুরোমানব সভ্যতাকেও এর অন্তর্ভুক্তির সচেতন প্রয়াস চলছে বিভিন্ন ভাবে। কাজেই আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিভ্রমণের মাধ্যমে মানবসভ্যতা স্থানান্তরকে আজ কিছু অলস মনের 'স্বপ্ন বিলাস' মনে হলেও আগামীতে এটি দেখা দিতে পারে 'বাস্তবতা' হিসেবে। বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক আর্থার সি ক্লার্ক মনে করেন যে, ২০৫৭ সালের মধ্যে চাঁদ, মঙ্গল কিংবা ইউরোপাতে মানব বসতি স্থানান্তর সম্ভব হতে পারে। জ্যোতির্পদার্থবিদ পল ডেভিসও অদূর ভবিষ্যতে মঙ্গলে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে আশাবাদি। বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং গণিতজ্ঞ ফ্রিম্যান ডাইসন মনে করেন কয়েক শতকের মধ্যে মাহাকাশের 'কুইপার বেল্টে' মানব বসতি স্থাপন সম্ভবপর হতে পারে। যেভাবে আমাদের পূর্বপূরুষেরা দুই লাখ বছর আগে একটা সময় আফ্রিকার গহীন অরণ্যে উদ্ভুত হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আহার আর বাসস্থানের তাগিদে, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের উত্তরসূরীরা হয়ত পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একটা সময় পা রাখবে আন্তঃনাক্ষত্রিক পরিমন্ডলে, খুঁজে নেবে এ অনন্ত মহাকাশের বুকে লুকিয়ে থাকা কোন এক 'দ্বিতীয় পৃথিবী'। মহাজাগতিক উপনিবেশের জন্য নয়, হয়ত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই।

**সমাপ্ত**

নভেম্বর ৭, ২০০৬

---

{নবম অধ্যায়, *প্রাণের উৎস সন্ধানে (প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে)* : অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ; অবসর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারী প্রকাশিতব্য}

তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য...

## তথ্যসূত্র (সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও ওয়েবসাইট):


১. ড. ম. আখতারুজ্জামান, বিবর্তনবিদ্যা, বাংলা একাডেমী (১৯৯৮); ২য় সংস্করণ, হাসান বুক হাউজ (২০০৪)।

২. অপরাজিত বসু, প্রাণের রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞান, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা (১৯৯৯)

৩. সুধীর কুমার দত্ত, জীবনের উৎস সন্ধানে, প্রতীক, ঢাকা (২০০৬)

৪. মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, জীবনের রহস্য সন্ধানে, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা (২০০০)

৫. শঙ্কর চক্রবর্তী, মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ, বেস্টবুকস, কলকাতা (২০০৪)

৬. রুশো তাহের, মানুষের মহাজাগতিক ঠিকানা, ঐতিহ্য, ঢাকা (২০০৬)

৭. অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা (২০০৫)

৮. ম. আখতারুজ্জামান, কোষবিদ্যা, বাংলা একাডেমী (১৯৭৫);৫ম সংস্করণ, হাসান বুক হাউস, ঢাকা (২০০২)

৯. ম. আখতারুজ্জামান, কোষ বংশগতিবিদ্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা (২০০২)

১০. চার্লস রবার্ট ডারউইন, প্রজাতির উৎপত্তি, ভাষান্তরঃ ড. ম. আখতারুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (২০০০), ২য় মূদ্রণ, হাসান বুক হাউজ (২০০২)।

১১. আইজাক আসিমভ, সূচনা, ভাষান্তর : পলাশ বরণ পাল ও শেখর গুহ, বুক ক্লাব, ঢাকা (২০০৬)

১২. প্রশান্ত প্রামাণিক, মৃত্যু : দর্শনে ও বিজ্ঞানে, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা (২০০৬)

১৩. বিবেকানন্দ রচনাসমগ্র (১ম ও ২য় খন্ড), অনুবাদ ও সম্পাদনা : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা (১৯৯৪)

১৪. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ, পঞ্চম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (২০০৫)

১৫. প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (পঞ্চম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা (২০০৩)

১৬. আসিফ, মহাজাগতিক আলোয় ফিরে দেখা, সময় প্রকাশন, ঢাকা (২০০৩)

১৭. বন্যা অহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনী, (২০০৭, প্রাকশিতব্য); অনলাইন আর্কাইভ : মুক্তমনা

18. Paul Davis, The Origin of Life, Penguin Books, UK (2003)

19. Bruce Jakosky, The Search for Life on Other Planets, Cambridge University Press, UK (1998)

20. Julius Rebek, Synthetic Self-Replicating Molecules, Scientific American, vol 271, no 1 (1994)

21. Gerald F. Joyce, Directed Molecular Evolution, Scientific American, vol. 267, no. 6 (1992).

22. Philip Cohen, Can Protein spring into Life? New Scientist (1997) ; also published in Nature, vol 382, no. 525 (1996)

23. Sidney Fox, The Emergence of life : Darwinian Evolution from Inside, Basic Books, New York (1988)

24. Tim M Berra, Evolution and Myth of Creationism, Stanford University Press, USA (1990).

25. R. A. Kerr, Origin of Life: New Ingredients Suggested, Science, vol. 210, pp 42-43 (1980).

26. Max P. Bernstein, Scott A. Sandford and Louis J. Allamandola, Life's Far-Flung Raw Materials, Scientific American (1999).

27. Christian D. Duve, The Birth of Complex Cells, Scientific American (1996).

28. Carl Sagan, The Search for Extraterrestrial Life, Scientific American (1994).

29. Leslie E. Orgel, The Origin of Life on the Earth, Scientific American (1994).

30. Ian Crawford, Where Are They? : Maybe we are alone in the galaxy after all, Scientific American (2002).

31. David Warmfl Ash and Benjamin Weiss, Did Life Come from Another World?, Scientific American (2005).

32. Bruce M. Jakosky, Searching for Life in Our Solar System, Scientific American (1988).

33. Jill C. Tarter and Christopher F. Chyba, Is There Life Elsewhere in the Universe? Scientific American (1999).

34. William J. Schopf, Cradle of life : the discovery of earth's earliest fossils, Princeton University Press (2001).

35. Lynn Margulis and Dorian Sagan, What is life?, Simon & Schuster (1995)

36. Philip Whitfield, From So Simple a Beginning: The Book of Evolution, MacMillan Publishing Company; Reprint edition (1995)

37. Geoffrey Zubay, Origins of life on the earth and in the cosmos, Origins of Life : On Earth and in the Cosmos, Academic Press; 2nd edition (2000)

38. A. G. Cairns-Smith, Seven Clues to the Origin of Life : A Scientific Detective Story, Cambridge University Press; Reprint edition (1990)

39. Clair Edwin Folsome, Life : Origin and Evolution : readings from Scientific American / with introductions by, San Francisco : W. H. Freeman (1979).

40. William J. Schopf , Life's Origin: The Beginnings of Biological Evolution, University of California Press (2002)

41. Andrew H. Knoll, Life on a Young Planet : The First Three Billion Years of Evolution on Earth, Princeton University Press (2004)

42. Richard Dawkins, The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution, Houghton Mifflin (2004)

43. Iris Fry, The Emergence of Life on Earth: A Historical and Scientific Overview, Rutgers University Press (2000)

44. Robert M. Hazen, Gen-e-sis: The Scientific Quest for Life's Origins, Joseph Henry Press (2005)

45. Freeman J. Dyson, Origins of Life, Cambridge University Press; 2 edition (1999)

46. Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, W. W. Norton & Company (1996)
47. Sol Spiegelman, An *In-vitro* Analysis of a Replicating molecule, American Scientist, vol 55, no 221 (1967)
48. M Eigen and P. Schuster, Hypercycle: The principle of Natural Self-Organization, Springer-Verlag, Berlin (1979).
49. Peter Jedicke, SETI: The search for Alien Intelligence, Smart Apple Media, North Mankato, Minnesota (2003).
50. Thomas D. Brock, Life at High Temperature, History and Education, Inc, Yellowstone National Park, Wyoming (1994).
51. D. McKay, E.Gibson, K Thomas-Keprta, Possible Evidence for Life in ALH84001, NASA/Johnson Space Center, SN, Houston, TX
52. Giuseppe Cocconi and Philip Morrison, Searching for Interstellar Communications, Nature, Vol. 184, no. 4690, pp. 844-846 (1959)
53. Carl Sagan, The Demon Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Random House (1996).
54. Stephen Webb, If the Universe is Teeming with Aliens... *Where Is Everybody?* Fifty Solutions to Fermi's Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life, Springer (2002)
55. Peter Ward and Donald Brownlee, Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe, Springer (2003).
56. Seth Shostak and Alex Barnett, Cosmic Company: The Search for Life in the Universe, Cambridge University Press (2003).
57. Alexander I. Oparin, Origin of Life, Dover Publications, {Russian ed, 1922} (2003).
58. Stanley L. Miller and Leslie E. Orgel, The Origins of Life on the Earth, Prentice-Hall (1974).
59. Jeffrey Bennett, Seth Shostak, Bruce Jakosky, Life in the Universe, Addison Wesley (2002).
60. Sean Henahan, From Primordial Soup to the Prebiotic Beach : An interview with exobiology pioneer, Dr. Stanley L. Miller, University of California San Diego, Access Excellence : http://www.accessexcellence.org (1996)
61. Web Links:
http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/305/5685/766.pdf
http://www.jb.man.ac.uk/research/seti/drake.html
http://www.ucmp.berkeley.edu/alllife/threedomains.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia
http://www.iscid.org/encyclopedia/Panspermia
http://www.seti.org/site/pp.asp?c=ktJ2J9MMIsE&b=178979
http://www.astrochem.org/PDF/Bernsteinetal2002a.pdf

http://www.chem.duke.edu/~jds/cruise_chem/Exobiology/miller.html
http://www.lpi.usra.edu/lpi/meteorites/The_Meteorite.html
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/O/Ozma.html
http://www.seti.org/science/a-message.html
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/SETI
http://setiathome.ssl.berkeley.edu/
http://openseti.org/OSNegadata.html
http://www.accessexcellence.org/WN/NM/miller.html

62. Mukto-Mona : The site for Bengali Freethinkers : www.mukto-mona.com